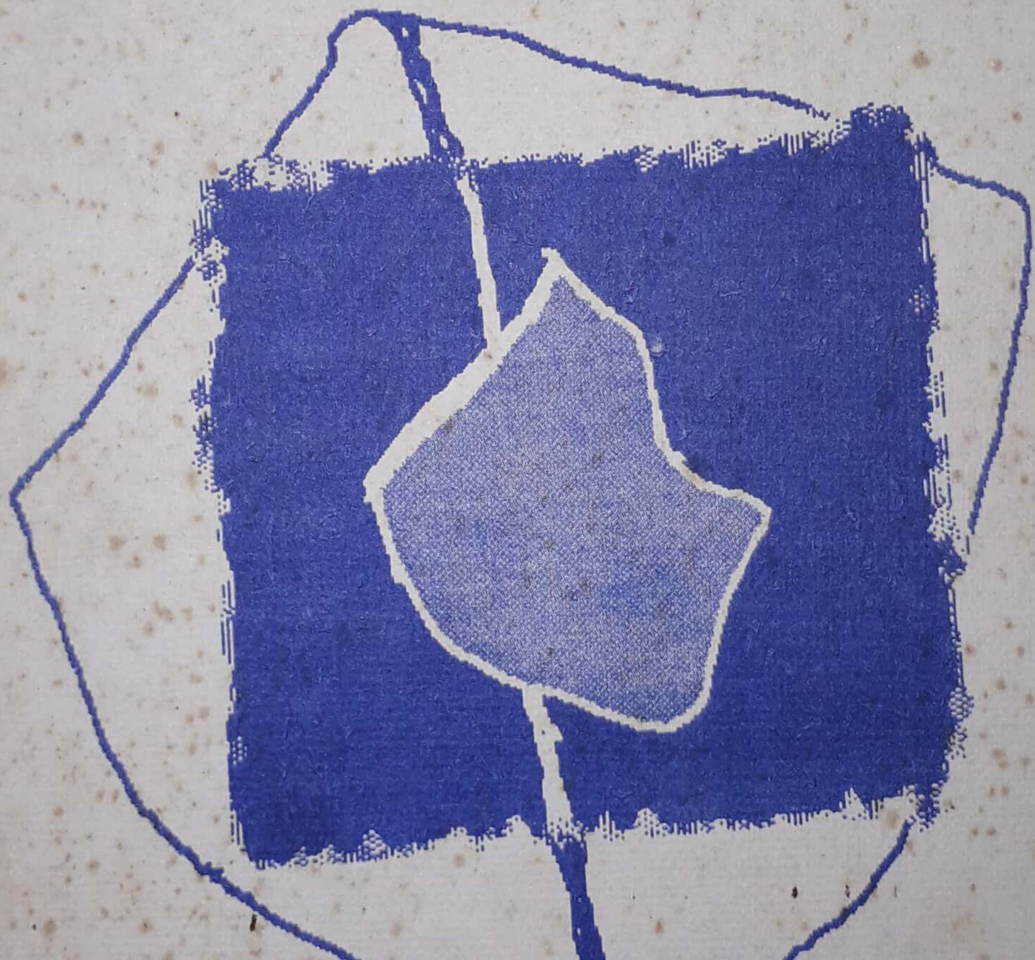
ফ স্ট্রীট স্কুল



ফৃস্টাট কুল

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল ফৃস্টাট কুল

ফ্রি স্ট্রীট স্কুল'র মূলপরিকল্পনা ঢাকায়। চট্টগ্রামে এর চূড়ান্ত সূচী, মুদ্রন বাঁধাই সম্পন্ন হলো।

কা. শা.

ফ্রী স্ট্রীট স্কুল

প্রথম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
আশ্বিন ১৪০২

সম্পাদক

কাজল শাহনেওয়াজ

প্রচ্ছদ

রোকন রহমান

কম্প্যুটার সহায়তা
লুৎফর রহমান

প্রকাশক

ঝর্ণা শাহনেওয়াজ
৯ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট (চতুর্থ তলা)
কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।

মূল্য : বিশ টাকা

ফৃ স্ট্রীট স্কুল

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

গদ্য

কবিতা

কাজল শাহনেওয়াজ

এক পশলা খোলা বাতাস



আমাদের বাংলা সাহিত্য আশি ও নব্বই দশকের তরুণদের হাতে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপে উপস্থিত হতে চলেছে। হুঁশিয়ার পাঠক টের পেতে যাচ্ছেন এক নতুন গভীরতার, যার বীজ ছড়িয়ে পড়েছে, শোনা যাচ্ছে আজ তার পাখার সাফল্য শব্দ। স্বচ্ছ হতে শুরু করেছে বিষয়গুলি।

কেমন সে সব বিষয়, যা দিয়ে নিশ্চিত করা যায় একের পর এক অর্জনগুলি - গত পনেরো বছরে যা যোগ হয়ে চলেছে। সাহিত্যের কোন অগ্রগতিতো সন তারিখ দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় না। সময়ের চরিত্র দিয়েই তাকে সম্পর্কিত করা যায় ইতিহাসের অন্তর্দন্দ্বের সাথে।

সময়ের প্রকাশ বহুরকম। কবিতার ব্যাখ্যা হাসিল করতে গিয়েই না চোখে পড়ে কতো নতুন বিষয় মুক্ত হয়েছে কবিতায়।

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক জগৎ সম্পর্কে বহু বহু মতামত রয়েছে। বাঘা বাঘা তত্ত্ববাহী সেরা সেই মডেলগুলি এতোই মুখরোচক যে কাকে ফেলে কাকে বেছে নেয়ার সংকট উপস্থিত হয়। তেমনি যুগ-বিভাজনের বেলায়; নানা রকম সুস্বাদু সংকল্প - আছে বিরক্তি, বিবমিষা, উচ্চাকাঙ্খা, উপরমনস্ক অবলোকন। নেই কোন মৌলিক লোকনকাঁচ।

সাহিত্যের দশক বিভাজন, সত্যিকার ভাবে, অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর একটা হিসাব। একে কোন প্রকার গাণিতিক পদ্ধতি বলা যাবে না। যদিও গণিতের প্রতীক রয়ে গেছে। এরকম হিসাব অশোভন ও অশ্লীল।

পথবান্ধব + যৌথমন

পথ-রচনা পর্বে পথিকের পদ যুগলকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হয়। তিনি তখন টেষ্টামেন্টের ঈশ্বর, যা স্পর্শ করবেন, তাই বেঁচে উঠবে। যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়লো বিনয় মজুমদার এর নাম। এটাই সেরা পথ। আবার ধারাবাহিক পথ পরিক্রমায় শ্রেষ্ঠতম পথিকের আবির্ভাব হতে পারে - যে গিয়ে পৌঁছায় সম্পূর্ণ নতুন এক বিশ্বে; সৃজনের আনন্দ ছাপিয়ে ভরে ওঠে রাস্তার সাথে পথের সংকল্প!

দুটি সময় বিশ্বকে (সাহিত্যের TIME SPACE) আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট করার জন্য উপরোক্ত উপায় দুটির মাত্রা জানাটাই সেরা সচেতনতা।

দেখা গেছে, পরিবর্তনগুলি সেজে থাকে দুই ভাবে। ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হবার সময় প্রথমেই এগিয়ে আসে তার সংগ ও আড্ডা, পাঠ ও জীবিকা। ব্যক্তির সামগ্রিক বৈদগ্ধ কোন ভাবেই মৌলিক কিছু হতে পারে না - তার সময় অর্থাৎ তার যৌথ জীবন থেকেই তা উচ্ছ্রিত।

আবার বিশেষ একটা সময়ের যৌথ বা সামগ্রিক মন তখনই কার্যকর হয়ে ওঠে, যখন ব্যক্তি মনগুলি সমসাময়িকতাকে মৌলিক ভাবে উৎখাত করতে পারে।

সাহিত্যের কালধারা এভাবেই চিহ্নিত হতে এগিয়ে যায়। দেশপ্রেম, পারিবারিক বন্ধন ও বোধিদ্রু - এই তিন জন সামগ্রিকতার ধারণা দিতে পারে নানান ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়ে - আর আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ, এটা একটা সাহিত্য বিশ্ব। চলো, একে নাম দেই। যেমন - তিরিশের কবিতা, ষাটের কবিতা, আশির কবিতা। আশির কবিতা বলবো না, হয়তো বলবো - সূচনাদিনের মুক্ত কবিতা।



বঙ্গ ভঙ্গ রোধ করা গেলনা কিছুতেই। কিন্তু ভূগোলের ভঙ্গ বঙ্গ ভাষার অখন্ড বঙ্গকে ততদিন কলুষিত করতে পারেনি, যতদিন পর্যন্ত না একনায়কীয় সামরিক শাসনের নষ্ট হাত তাকে স্পর্শ করেছে।

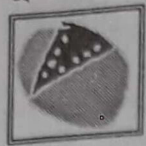
রেলপথ যেমন উপমহাদেশের দূরবর্তী দুর্ভেদ্য রহস্যময় স্বাবলম্বী গ্রামগুলির কাছে বৃটিশ শাসন কৌশল পৌঁছে দিয়েছিলো, ষাট দশকের একনায়কী গণতন্ত্র যৌথ মূল্যবোধকে তেমনি চরম অপমান ও উপেক্ষা প্রক্রিয়া চালু করে। শুরু হয় ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পরাজয়। যৌথমন নিজেকে আক্রান্ত হতে দেখে এমন একটি আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে যে, উনিশশো সত্তুরের দেশপ্রেম নতুন সংবিধান রচনার সুযোগ করে দেয়।

অনেকটা আপতিক বলে মনে হলেও যৌথমন টের পেল না যে, এবারো তার হাতে রইলো ভৌগলিক সম্পাদনা-ই।

সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ, ১৯৭১। তীব্র স্বাধীনতা...। একটা অনন্যতা। অনেক বীক্ষণ, অনেক উপমার জন্ম। পরাবাস্তব জীবন। ভেল্কি বাস্তবতা। যুদ্ধের বিষয়গুলি যেন মাছ - অজস্র, অফুরান, অঢেল। সাহিত্য ধীবরদের হাতে নেই নতুন মাছ শিকারের চাঁইদোয়ারী। পথবান্ধব জ্বলে উঠতে পারেনা যৌথমনের কাছে।

যে কথা বলার জন্য এই ভূমিকা, তা হচ্ছে, একনায়কী সামরিক শাসনের সাথে আমাদের সাহিত্য কালপর্বের সম্পর্ক।

মুক্ত কবিতার চলাচল



বাতাস কি সেইরকম আছে - সে রকম আত্মভোলা ছটফটে স্বভাবের? আমরা তো চাই বাতাসের নিজস্ব ঘ্রাণ, আপন গতি, ছন্দমুক্তি। দেখি ওরা উপকূল পার হয়ে শহরের টানে এগিয়ে যাচ্ছে। তরুণ উল্লাশের শীষ শোনার জন্য দলগুলি হল্লা করছে। বাতাশের গায়ে আঁশ গন্ধ, খানিক আগেই বুঝি খেলছিল ওরা হাঙ্গরের ফিনের সাথে।

সেই সব জিনিষ, যা বহু শতাব্দী ধরে এই বদ্বীপের বাশিন্দাদের ঘরে ছিলো... সেই সব ঠান্ডা ও নরোম, ছোট ও মোলায়েম, প্রদোষের ও সায়াহ্নের, নদী ও হাটের, ঘোমটার আড়ালের বিষয়গুলি - ওরা গৃহবন্দী করলো আর তারপর ওরা সেখানে রোপণ করলো ভয়, উৎকণ্ঠা, বিশ্বাসভঙ্গ - ধর্ষণ হয়ে উঠলো সেরা বিলাস, হত্যা ঈদের সেমাইয়ের মতো সস্তা ও সাধারন - ওরা মানুষকে ব্যঙ্গ করার জন্য ফ্যাকাশে জীবনের সামনে ঝুলিয়ে দিলো রঙীণ পিকচার টিউব। সামরিক তাৎক্ষণিকতা দিয়ে অস্ত্রের মুখে পরাজিত করলো সেই সব চিরকালীন স্থৈর্য ও ধ্যান - যা দিয়ে নৌকা চালাতো, বর্গী তাড়াতো।

নভোতলীয় বিদ্যালয়



সাহিত্যে এখন আর কোন অবস্কিউর কোডের অবকাশ নেই। কবিতা এক ধরনের কোড লিখন। এক এক জন মৌলিক কবি নিজের কোড সেট উদ্ভাবন করেন। হর্ষ, বিষাদ ইত্যকার আদিম কোড কোন একটা তূরীয় ভাব অতিক্রম করলে পর প্রাপ্তির সব বিষয় - এক একটা সত্ত্বায় বা বাক্যে রূপান্তরিত হয়। তবে বাক্য দেখা যাচ্ছে ভাবের কোড গুলির একটা বিশেষ সংগঠন। কোডগুলি ব্যক্ত অনুভবকে অব্যক্ত রূপে সঞ্চয় করে রাখে। যখন পাঠ হয়, তখনই ফিরে যায় নিজের অকুঞ্চিত অবস্থায়। পূণ:নির্মান করে রূপান্তরের পূর্ব অবস্থা। কোডকে বলা যায় কুঞ্চিত অনুভব। যেন ডি.এন.এ অনু।

খোলা আকাশের নিচে বসে আমাদের অভিবাসন প্রিয়, পরিযায়ী স্বভাবের সেই সব আদিম প্রেরণার কোড খুঁজে বের করা যাক যাতে জল, জলাশয়, ভাঙ্গা গড়া ও মেঘ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। আমরা যেন ঘামতে ঘামতে উদ্ধার করি কেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বদ্বীপের পলিমাটিতে বসতি গড়েছিল? ওরা কি আসলেই বিজিত বর্বর, না কোন পলাতক যাযাবর - যার পেশীতে শষ্যের আনন্দ, চোখে মাছের পিপাসা। যার কোন বাদামী দেবী, পাথরের বসত বা দীর্ঘ স্বরের ক্ষুধা ছিল না। সবুজের বিশেষ হিউ ভালোবেসে থেমে ছিল সেই ভাগ্যান্বেষী পরিব্রাজক দল। পলির ভিতর শক্ত মাটি খুঁজে বের করেছিল।

জলাভূমি ও অন্ধকার অরণ্যের কোন স্মৃতি আমাদের রক্তের ভিতর খেলা করে? এতো ছেঁড়া ছেঁড়া কেন সেই মুখগুলি?

আধুনিক - এই শব্দটি আর আমাদের কাছে বিশ্বাস্য নয়। এক সময় একে একটা লোকন কাঁচ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছিলো, বলা হয়েছিলো এটা একটা লক্ষণ - তারা একে ব্যবহার করেছে

ক্যাথীড্র্যালের ভিতরে ঢুকিয়ে
উপনিষদের কোলে বসিয়ে
সংঘের আত্মমৈথুনের ব্যক্তিগত কামরায় নিয়ে
মরুঘোড়ার শীৎকারের রাতে তাবুতে ডেকে

আরেকদল পাল্টাপাল্টি নামে, অথবা অন্য আদলে লাগিয়েছেন

উদ্বৃত্ত শ্রমের তত্ত্ব ও লাল রঙের পাছা
ক্ষমতার বিষাদ ও জাতিয়তাবাদী নিতম্ব
নৈর্ব্যক্তিক যৌথ খামারের পোষা পুষি

আজ কাছে এলে নিখিলের বমনেচ্ছা জাগে। তুমি এতোদিন ধরে ছিলে অথচ আমাদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলে না - ছিলে, তাই তোমার কথা আজো মনে পড়ে আমাদের ডাইনোসরদের মনে।

বাংলা কবিতার বিষয় বৈচিত্রের বিশেষ সম্প্রসার ঘটেছে কিনা সেই বিতর্ক থাক। তবে স্মরণাতীত কালের মধ্যে এই প্রথম কবিতা মিডিয়াকে খুব নির্লজ্জ অবস্থায় দেখে ফেলেছে।

গণমাধ্যম বরাবরই ছিলো প্রকৃত কবিতাকে খাটো করার চেষ্টায় ব্যস্ত। সামরিক শাসন কবিকেও বাধ্য করেছে নানা রকম মনোনয়নের মাধ্যমে কবিতার মুক্ত প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার। আর সেই মূঢ় চেষ্টার প্রধান সহযোগী ছিলো আমাদের নির্বোধ মিডিয়া।

ভেসে গেছে সব কবি প্রশিদ্ধি। ক্ষয় পাওয়া ব্যথিত ব্যক্তির সর্বোপ্রকার ডিজইন্টিগ্রেশন কাটিয়ে ওঠার শক্তি খুঁজতে গিয়ে শুরু হয়েছে আলাদা পথ অন্বেষণ। কবিতার রাজকুমারেরা, কোটালপুত্রেরা, সেনাপতি তনয়েরা এবং সব ভগ্নীরাও চাষীসন্তানদের সাথে মিশে যাচ্ছে।

কবিতা যে ধ্যান পছন্দ করে তা পরিষ্কার বোঝা গেল। ধ্যান - অপেক্ষার, অবলোকনের। সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর দিকে ঘোর জমেছে।

উপমহাদেশীয় মন

অস্থির বেহিসাবী দূরদর্শী চিত্ত কি উপমহাদেশীয় মনকে খুঁজে পেয়েছে ? এটা খুবই জরুরী...বাংলা ভাষা ও তার ভ্রাতা/ভগ্নী ভাষাদের একটা নিয়মিত যোগাযোগ... একটা সত্যিকারের সম্পর্ক স্থাপন... যাতে বর্ণমালার বিভিন্নতা উপমহাদেশীয় মনকে মেঘাচ্ছন্ন না করে...

দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী পাতা

এই পাতাটি সামনে পড়লে আমার ফ্যালফ্যাল করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আমি কি আমার সবটা দেহ ঐ কাগজটার পেছনে লুকিয়ে ফেলতে পারবো না? কিন্তু ডাবল ডিমাই মাপের ছাপা অক্ষর দেখে পাগল হবার দশা। খালি মনে পড়ে সেই সব লিকলিকে দৃশ্য - রাতে লিখেছে আর পরদিন ভোরেই দৌড়ে আহসান হাবীবকে কবিতা দিয়ে এলো আর উনি মুগ্ধ হয়ে ছাপিয়ে দিলেন - হাজার হাজার হাজার পাঠক পড়ে ফেল্‌লো। সত্যি ভয়াবহ সেই পরিনতি - যে তরুণ কবিরা হঠাৎই খ্যাতিবান হয়ে উঠেছিলো - তারা কোথায় আজ? কেন ভাই এতো ছুটছো! কবিতা প্রাণ তুমি কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবিতা হয়ে গেলে!

অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়গুলির মোটা ঠোঁট একটু একটু করে হাসছে

কবিতার টিকাভাষ্য ভাবাই যায় না। তবু যার কবিতা আত্মপরিচয়ে উজ্জ্বল, তার কবিতার জমা খরচের খাতায় কিছু অগ্রিম অহংকার কেউ এসে দিয়ে যেতেই পারে। পাহাড় হেসে উঠতে পারে কোন উপমার আঘাতে, নদীর চর গলে যেতে পারে, ফাঁকা ঘরে একা কেঁদে উঠতে পারে কম্প্যুটারের মন।

বহুভাবে টিকা দেয়া যায়। তবে যারা বৈদগ্ধ্য-তড়িতাহত, তাদের প্রিয়তা শুধু আমদানি করা কাগজে । মসৃন কাগজে পিছলে যাওয়ার সময় নেই। মন্ড বেলে কাগজ বানানো যাদের এক নম্বর প্রতিভা, ওরা গায়ে গতরে খাটতে ভালবাসে খুব, পাথর ভাঙার অভ্যাস আছে, নদীর বুক থেকে বালি তোলার ক্ষমতাও তাদের আয়ত্বে - এমন কি যখন লিখতে বসে, বা পড়তে দাঁড়ায় বা স্বপ্ন দেখতে শোয় তখনো তাদের পেশীগুলা নিজে নিজে কাঁপে, কাঁপতে থাকে - যদি আরো কিছু হয়ে যায় ... ! কিন্তু অস্থির ধ্যানীর কি আশা? গণমাধ্যম কি তার ছোট্ট সব পাখায় হাওয়া দিতে পারে? তার সব কিছু মনে রাখার শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে পারে? সামান্য একটু সমর্থন, নি:শব্দ প্রেরণা, অল্প খরচের কিছুটা দায়িত্ব কি তাদের জন্য থাকে না?

টিকাভাষ্য রচনার জন্য চেষ্টা করা যাক রিফাত চৌধুরীর কবিতা। কিন্তু ওর কবিতা বিষয়ে ভাবতে গিয়ে অনেকটা সময় চুপ করে থাকার দলে আমি। দুটি উদ্ভিদ যেভাবে পরস্পরকে মতামত দেয় সে রকম পাতা কাঁপানোর ভাষায় শুধু কিছু বলা যায়।

মোটা কবিতার দাপট থেকে ও আশ্চর্য রকম মুক্ত। ও মৃত্যুর প্রতিবেশী, তাই দেখে সরল চোখে। একবার মাত্র যেন দেখে, তারপর চোখ বুঁজে ধ্যান করে। ওর কাছে চিন্তার মূল্য অপরিসীম, তাই ও চিন্তাকে ছবিতে রূপান্তরিত করে। একটা স্পষ্ট দার্শনিক উপায় ওর এই ছবি ফোটানোর কাজ। ওর স্বভাব সাদা কালো ফটো রচনার সময় মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ঘৃণা, ভয়, শোক আর উদারতা ফ্রেমে ঢুকিয়ে দেয়া। নানা অনুপাতে মিশানো হয়, ফলে বহুরকমের রস নিসৃত হয়। নেতার ছবির ছায়ার নিচে কর্মক্লান্ত শ্রমিক ঘুমায়।

ওর কবিতার বিবর্তনের পর্যায়গুলি এরকম ঃ

১৯৮০-৮৫	কল্পনা বিহ্বল দূরান্বয়ী কবিতা	- সাংসারিক চিত্রকল্প
১৯৮২-৮৭	বর্ণনাধর্মী রূপঘন অতিলৌকিক কবিতা	- চূর্ণবিচূর্ণ ইমেজ, নৈসর্গিক উন্মাদনা
১৯৮৫-৯০	প্রতীকি হ্রস্ব দার্শনিক কবিতা	- সজ্ঞা নির্ভর
১৯৮৮-৯৩	ফটোধর্মী সহজাত কবিতা	- অতিসজ্ঞা ও ভাবোন্মত্ততা
১৯৯০-এখন	আত্মস্বভাবী স্বীকারোক্তি মূলক	

রোগনামচা

ও মাঝে মাঝে এক প্রকার গদ্য লেখে যা ওর চিন্তার সমাধানের মতোই। খুবই বাস্তব, সবুজ চিন্তার ক্ষেতে গজানো ভূঁই কুমড়ার বেদনা, বাধাকপির নিরপেক্ষতা, মেঘের অভিমান - সব সত্যিকারের জিনিষ। স্বীকারোক্তিমূলক এই সব রচনা অন্তর্গত ইনহিবিসন কাটিয়ে ওঠার উপ বলে মনে হয়। ও যেমন নিজেকে প্যারানয়েড বলে চিহ্নিত করেছিল। সত্যিই যদি তাই হয়, তবে এই রচনাগুলি রোগীর রোগনামচা।

ও একটা কবিতা লিখেছিল, নাম *ফিনাইল ফুল* -

ফুটে উঠলো প্রস্রাব রঙা ফিনাইল। ফুটে উঠলো রোদ্দুরভা ফিনাইল। ফুটে উঠলো গোধূলিরঙা ফিনাইল সেবা সদন যাবো, যাবো সেবা সদন, সেবা সদন কোথায় কে জানে?

এরকম একটা আনন্দরূপ চোখে পড়েনা।

খায়রুল হাবিব

অনামি সৃজনশীলতার মেনিফেস্টো '৯৫

প্রস্তাবনা :

এমন নয় যে আস্তিকতা হলো কোন এককেন্দ্রীক নরমতার প্রতি নির্দ্বন্দ্ব সমর্পণ। নতুন জায়গায় দাঁড়িয়ে, নতুন দৃষ্টিকোনে দেখা, তাইতো আস্তিকতা। সমরবাদি সন্ত্রাস, টুপিবাদি, বোরখাবাদি সাংস্কৃতিক কারচুপি, প্রাগুক্ত মতবাদের তালুকদারী এ বিচারে নাস্তিকতা, এগুলো এগুলোর পথ বন্ধ করে দেয়।

ধর্মনিষ্ঠ অদৃষ্টবাদ তার ইহজাগতিক অংশকে এমন এক প্রয়োগধর্মী যৌক্তিকতায় দাঁড় করাতে চেয়েছে যেখানে মানবিক আচরণ হয়ে উঠেছে ব্যবহারিক পণ্যগুণবাহী উপকরণঃ অবাধ বাজার অর্থনীতির লাভ লোকসান খতিয়ান যেনো সোয়াব ও গুণের নামান্তর মাত্র। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদিরাও মানবিক বিচিত্রতাকে প্রয়োগধর্মী উপযোগের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সংস্কারের শেকলছেঁড়া মানুষের অনুসন্ধান যে উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ বিবেকিকতার স্বত:স্ফুর্ত অন্বেষণে বিস্তৃত; মেন্ডেলের মটরশুটিখোর মানুষ যে ভাবতে শুরু করেছে ঃ বস্তু প্রয়োগধর্মী উপকরণ হওয়া সত্বেও অন্য কার্যকারণ অথবা উপযোগিতা নিরপেক্ষভাবে শুধু তার অস্তিত্বের গুণে বিস্ময়কর; বাদানুবাদে জড়িত গোষ্ঠি এটা জেনেও না জানার ভান করেছিল।

খায়রুল একইসাথে বহু বিষয় নিয়ে ভাবতে ও ভাবনাগুলোর আন্তসম্পর্ক স্থাপনে কি পরিমান পারদর্শ, এই লেখাটি তার প্রমান। যে সব কবি কবিতার নিত্যপ্রয়োজনীয় চেহারা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আঁৎকে ওঠে, যারা পাপ করতে চায় না শব্দের সাথে, তাদের জন্য খুবই দরকার হতে পারে এই মেনিফেস্টো। খায়রুল কিভাবে নোনা ধরায় জনপ্রিয় ধারণার গায়ে, বিষময় করে তোলে একটি উপমা, কোন গোপন তেজস্ক্রিয়তা খেলে যায় ওর অন্তরে - লেখাটি তাও বলে দেয়। - কা. শা.

ইহজাগতিকতা ও আদিবাসি অদৃষ্টবাদের সীমাসন্ধিতে আমি একটি শব্দবন্ধের প্রস্তাব করছি ঃ 'জৈব-বাস্তবতা'। বোঝার সুবিধার জন্য এ প্রস্তাবটিকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। যে শ্রেণীগুলো কখনো একটাকে এড়িয়ে অন্যটায় এগোয়না। উল্টোমুখী শব্দকাতরতায় আমাদের সৃজনশীলতা যাতে আবার না পা পিছলায়, তার জন্য এ তিনটি পর্যায়ের সাবধানী বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারন, প্রতিটি পর্যায়ের অন্তর্নিহিত কোন মন্ত্রগুপ্তি নেই, বরং চেতন অবচেতনের দোলাচলে একই শব্দ একই চিহ্ন বারবার সম্পূর্ন ভিন্নার্থে ভিন্নরূপ ধারণ করে।

আদিম ভালোবাসা ও জলজংলার বিষণ্নতায় মানুষের প্রাকৃত-বাস্তবতার সুত্রপাত ঃ পুঁথি পাঁচালিতে সূর্যপুরুষের সাথে চন্দ্রনারীর বিয়ে, মাছের সহবাসে মানবী গর্ভে ভ্রূণ সঞ্চার ঐসময়ের নান্দনিক উন্মোষের লক্ষণ, পারলৌকিক ভয়ের সাথে মেশে অসহায় ভয়ের বিকৃত মুখচ্ছবি ঃ স্বপ্নলব্ধ দর্পণে দেখা এ মুখচ্ছবি মানুষকে দর্পণ ভাঙ্গারও উস্কানী দেয় ঃ প্রমিথিউস দেব নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মানুষকে শেখায় আগুনের ব্যবহার, কাঁধে পেতে নেয় দেব নিগ্রহের

মৃত্যুহীন জোয়াল। আগুন হাতে পেলো মানুষ। পার্থক্য শিখলো সে আগুন ও আলোর। পত্তন ঘটলো গ্রাম ও গোষ্ঠির ঃ গুহা থেকে বেরিয়ে; শিকার পর্ব, কৃষিপর্ব পেরিয়ে সে মুখোমুখি হয় সংস্কৃত বাস্তবতার। বিজ্ঞান ও যুক্তিচর্চার দিকে সে এগোতে থাকলো। পর্যায়ক্রমিক এ বাস্তব সংশ্লেষণে বিজলি চমক, বজ্রপাত থেকে দৈব-নিয়ন্ত্রণ তথা দানব ও দেবতার কারসাজি অদৃশ্য হল। ফুল, ফল, পাতা হাতে প্রার্থনার বেদিমূলে মানুষ হয়ে উঠলো দ্বিধাগ্রস্থ। সে আবিষ্কার করলো একের পর এক নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্র।

প্রাকৃত প্রভু ক্রীতদাসির প্রতি যথেচ্ছ উপগত হতো, দাসীপুত্রের বরেণ্য নৃপতি হবার ঘটনাও ইতিহাসে দুর্লভ নয়। দৈবের শৃংখলাহীন যন্ত্রকে দাসের মতো ব্যবহার করা যায় বটে, কিন্তু তার সাথে কি জৈবিক মেলবন্ধন সম্ভব, হৃদয়ের আকাঙ্খায় জড়িয়ে যন্ত্রকে কি 'তুমি' বলে ডাকা যায়? এ পর্যায়ে ভয় খেয়ে যে শিল্পী প্রাকৃত আরণ্যক পল্লী আশ্রিত বাস্তবতায় ফিরে যেতে চাইছে, তার ভয়কে অমূলক বলে নাকচ না করলেও তাকে কিছুতেই সাহসি অভিধা দেয়া যায় না।

যুক্তিধার্মিকতার ব্যবহারিক স্পর্শে প্রতিষ্ঠাণগুলো যেমন ; তেমনি অপরাপর সম্পর্কগুলো বারবার উপকরণে পরিনত ঃ বস-ট্রাঙ্কুলাইজার-স্ত্রী সহবাস-বস। উপকরণবাদের শৃংখলাসর্বস্বতা ও যৌক্তিক ধর্মসংঘের আড়ষ্ঠতা মুক্ত হতে; দেহবাদি বাউলেরা যখন হ্যাজাক বাতি ও নৌকার ছইয়ের মিলের কথা বলে তখন তা আসলে স্বাশ্রয়ের মিল ইঙ্গিত করে। শৈশবে বা প্রাকৃত চেতনায় যে বিস্ময়বোধ তার চারদিকে একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কের পরিমন্ডল উঁকিঝুঁকি মারে। সে আতঙ্ক জৈব আতঙ্ক। এ - আতঙ্ক আমাদের বিস্ময়বোধ, আনন্দের অধিকার কেড়ে নেয়।

প্রাকৃত ভয় ও সংস্কৃত যৌক্তিকতার ওপারে চেতনার যে তৃতীয় পর্যায় ঃ তাকে এখন বলতে হবেঃ জৈব-অধ্যাত্ম ঃ যা মানুষকে সেই অন্তস্থ শক্তির সন্ধান দেবে। যার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে অকারণ আনন্দে।

মনে রাখা ভাল যে আমরা কেউ চেতনার কোন শুদ্ধ স্তরে বাস করিনা। শুদ্ধতা বস্তুত চেতনাকে খন্ডবিখন্ড বিভাজিত করার অসৃজনশীল প্রয়াস যার চাপে বারবার বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রাণস্পন্দন ও মতবাদের।

আশপাশে যা ঘটছে :

দুটি কবিতা সংকলন আমি প্রায়ই পড়ি। একটি কাজল শাহনেওয়াজের *রহস্য খোলার রেঞ্চ*, অন্যটি আহমেদ মুজিবের *প্রেসের কবিতা*। কবিতার অতি অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ভিত্তিভূমি নির্মাণে এ দুজন পর্যায়ক্রমিক ভাবে সফল।

প্রেস টেকনোলজি মুজিব আর মুজিবের কবিতার মধ্যে স্বচ্ছতোয়া আয়না হয়ে উঠেছে ঃ বিজ্ঞান বা মেশিন টুলস এ কবিতাগুলো লেখেনি বরং কবিতার সঙ্গলিপ্সা মেশিনকে সংবেদনশীল চলকে রূপান্তরিত করেছে। অনুষঙ্গের জড়ত্ব ভাঙ্গার জন্য ভাষার যে জ্যান্ত জৈবিকতা দরকার তাতেও মুজিব সফল। মানুষ তার স্বভাবজাত সমত্ব দিয়ে যতই যন্ত্রকাতরতা প্রকাশ করুক যন্ত্রের নিজস্ব অভিধানে কাতরতা দীর্নতা জাতীয় ভাবাবেগের অবকাশ নেই। ফলে মুজিবের অনুকরণে যদি

অন্য কেউ যন্ত্রানুসঙ্গে মেতে উঠতে চায় তাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আত্ম নিয়োজিত না হলে এ অনুষঙ্গের প্রাবল্য কবিতাকে অনিবার্য জড়ত্বের দিকে ঠেলে দেবে।

মননশীলতার অভাবহেতু টেকনোক্রিটিক বহিরঙ্গে যদি কবিতা জারিত হয় তাহলে আগামীকালকের অগ্রসর তথ্যসমৃদ্ধ পাঠকের কাছে আজকের উজ্জ্বল কবিতা হয়ে উঠবে নিষ্প্রভ, অবসোলিট। শুধু টেকনোলজির ক্ষেত্রে নয় নাগরিক অনুষঙ্গের বেলায়ও একই বিচার প্রযোজ্য। আমাদের এখানে ষাটের, সত্তরের অনেক কবি নগরায়ণের অনুকারকতায় সংক্রামিত হয়েছেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে পারেননি অর্থাৎ টেকনিক ব্যবহার করেছেন বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধিৎসাকে এড়িয়ে। কেন্দ্রনিবিড় ধর্মানুষঙ্গ একধরনের হস্তমৈথুন যা থেকে উত্তরণের আয়ুধ অধ্যাত্ম নির্মিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন।

কৌতূহল অধ্যাত্মের আরেক নাম।

অধ্যাত্মে কবি যে কেবল সৃষ্টি রহস্য দেহতত্ত্বে মজে যাবেন তা নয়। মানুষের বড় চাওয়া পাওয়া থেকে ছোট চাওয়া পাওয়ার তুচ্ছতাকে সূক্ষতম ইন্দ্রিয়ে ধারণ অধ্যাত্মের আয়ত্তাধীন। ধর্ম যদি আনুষ্ঠানিকতা সে আনুষ্ঠানিকতা মুক্ত ছন্দে ভাঙ্গার দায়িত্ব আধ্যাত্মিক কবির। অনুভূতির নৈরাজ্যকর প্রত্যক্ষতা এ অধ্যাত্মের অন্যতম পালনীয় শর্ত।

আবার শর্তবাহিত সত্যকে আমরা যখন দশদিক থেকে টর্চ মেরে প্রশ্ন জর্জর করতে ভুলি তখন সত্যই হয়ে উঠে রক্ষাকবচের বদলে আত্মঘাতি মারনাস্ত্র। কাজলও একসময় যন্ত্রদীর্ণ কবিতায় মেতে উঠেছিল। তবে *রহস্য খোলার রেঞ্চ* এ রেঞ্চ শব্দটি বাদ দিলে টার্ম হিসেবে যন্ত্র এ সঙ্কলনে একেবারে নেই। মনে হয়েছে অনেকদিন না খোলা একটা জানালার শিক অস্ত্রপচার করে গলানোর পর সে ঘরটায় কোন ভাবেই তিনি যন্ত্রকে ঢুকতে দিতে চান না। কে জানে হয়ত দেবেনও। কাজলের মেয়ের নাম যে দ্বৈত, দৈত্য নয়। কাজলের এ সংকলনে প্রত্যেকটি কবিতা টেকনোক্রিটিক সন্ন্যাসব্রতের সার্থক উদাহরণ। চারপাশের সবুজ এত শুকিয়েছে যে নিরেট লোহাকেও সবুজ রোদ চশমার ভেতর দিয়ে সবুজ দেখলাম বলে নিজেকে স্বান্তনা দিতে হয়। কাজলের কবিতাগুলো স্বান্তনা কবিতা নয়, তরতাজা সহবাসের আনন্দ মন্ত্রে মন্থিত।

অনুষঙ্গের প্রাবল্য বা বাহুল্য কবিতাকে অধ্যাত্মের দিকে যেতে না দিয়ে প্রাকৃত বাস্তবতার দিকে ঠেলে দেয়। এ জন্য প্রয়োজন বিষয় বিযুক্তি বিষয়ান্তর অসংলগ্নতা। ভাষা যত বেশী বিমূর্ত ততই তা প্রাকৃত ও একদেশদর্শী আর মুর্ত হলে বাগ্দেবী হয়ে উঠবে কুহেলিকামুক্ত জৈবতাশ্রয়ী। *জলমগ্ন পাঠশালা'র* পর কাজলের এ সংকলনটির ভাষা আন্ত মহাদেশীয় দুরপাল্লার টার্নওভার।

আমার পথ ঃ জ্যান্তমরার কাটাছেঁড়া ঃ বাংলাদেশের পার্সোনিফিকেশন ঃ

সামনে দিন আসছে যখন ভ্রুণাবস্থায় জিন বিশ্লেষনের মাধ্যমে বোঝা যাবে গর্ভজাত শিশু সমকামী কিনা। চাইলে জিনস্থ ডি, এন, এ কোড বদলে দেয়া যাবে। খ্রীস্টিয় চার্চ, ব্রাহ্মণ

পুরোহিত, মাদ্রাসার মোল্লা অর্থাৎ আপাত প্রচারিত সমকাম বিরোধীদের হাতে এ ব্যবস্থা প্রয়োগের ভার পড়ল : জিন সংকেত এরা ভ্রূণাবস্থায় এমন ভাবে বদলে দিল : একদল শিশু রক্তজবা, চন্দ্রমল্লিকা তথা তাবৎ ফুলে অফুলে পেতে থাকল গোলাপের খোশবু। অন্যদল শিশুর জৈবিক অভিধানে মুছে গেল ফুলের উপযোগ : জন্মমুহূর্তে নিশ্চিৎ করা হল কে চড়বে ঘাড়ে আর কে হবে ভারবাহী পশু। স্বীকার করি জিনসংকেত বদলে দুরারোগ্য বংশানুবাহিত রোগসমূহ সারিয়ে তোলা যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের মালিকেরা যে এ আবিষ্কার তাদের রক্ষীবাহিনীকে সবলতর করতে ব্যবহার করবেনা তার নিশ্চয়তা কি ? এ অস্ত্র প্রয়োগে যে যাবতীয় অপছন্দনীয় জীবনধারা উপড়ানো হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি?

বলছি না আবিষ্কারের পথ বন্ধ হোক। বলতে চাইছি : ব্যক্তিকে তার জীবনভঙ্গি নির্বাচনের অধিকার দেয়া হোক।

॥ যা বুঝলাম না তাকে সাব কালচার, ফোক কালচার বলে শোকেসে সাজিয়ে রাখা বা অপ্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেয়া চলবে না। দ্রষ্টব্য : সেনা অফিসারগন বেসামরিক লোকদের বলে ব্লাডি সিভিলিয়ান, বাংলাদেশীরা আদিবাসিদের বলে উপজাতি! চলবেনা ॥

॥ কবিকণ্ঠ বা কবিতাকেন্দ্রের যে সব কবি খুনি জান্তার কাব্যপিপাসা মেটাতে বঙ্গ ভবনে গিয়েছিল তাদেরকে যেমন ক্ষমা করা যায়না সেরকম ৮৭'র ২৮শে ডিসেম্বর তরুন সঙ্গিতকার হ্যাপি আখন্দের মৃত্যুর দিনে সদ্য গঠিত 'জাতীয় কবিতা পরিষদের' যে সমস্ত অকবি 'হ্যাপি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মারা গেছে ওর স্মরণ সভায় গেলে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে' এ ধরনের কথা বলেছিল তাদেরকেও ক্ষমা করা যায় না। কলাভবন চারুকলার বাউন্ডুলেদের আয়োজিত তাৎক্ষণিক শোকসভায় জাতীয় কবিতা পরিষদের পক্ষ থেকে নয় ব্যক্তিগত দায়িত্বে একমাত্র নির্মলেন্দু গুন এসেছিল। জাহাঙ্গীর নগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের শু...র বাচ্চা অধ্যাপক কবিদের উন্নাসিকতা হ্যাপির মৃত্যুতে উৎসর্গিত পোষ্টার ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনের বিভিন্ন কক্ষ থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য চাপ দিতে থাকে। এই জাতীয় কু..র বাচ্চা পরিষদের এক কর্তাস্থানীয় কুকুর পরে নারীবাদি ঘেউ ঘেউ করে নিজেকে প্রগতিসরণীর ট্রাফিকপোষ্টে দাঁড় করাবার প্রয়াস নেয়।॥

॥ পাঠক প্রিয় বিষয়ের ওপর ভর করা অধ্যাপকদের অনেক দিনকার অভ্যাস। কখনো জীবনানন্দ ভর, কখনো নারীবাদ ভর অধ্যাপকদের চিনে নিন, ভর সাহিত্য কবর দিন।॥

॥ একদল আছে যারা তরুণদের বেসামাজিক বলে নিধন করতে চায়। আরেকদল প্রতিস্পর্ধিদের নেশাগ্রস্থ বলে নিকাশ করতে চায়। আমার ধর্ম আমার কাছে রাষ্ট্রের কিছু বলার নাই।॥

॥ ইতিহাসকে যারা জিনসের পাছার পট্টি মনে করে তাদের গন্তব্য হয় মহিলা সমিতির মডেলিং থিয়েটারে নয় টি এস সির আবৃত্তি বাহিনীর কাছে। আবৃত্তিকার ও কারিনীগন নাকি কবিতাকম্প মাপার জন্য মেয়ে হলে দুধের বোঁটায় ছেলে হলে বিচির গোড়ায় গিজার কাউন্টার ঝুলিয়ে রাখে।॥

॥ মগ্ন পরাবাস্তবতা ছিলো ল্যাংটা এহন মাথার টুপি। আরে দোস্ত কারচুপির কল বাতাসে নড়ে।॥

॥ ছায়ানট নটিরা ভাবে ওরা ঠিক। কাঁধে শান্তি নিকেতনী ব্যাগ ঝোলালেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ ওদের ভেতর নাই। সস্তা শ্রমের অপব্যবহার করে ওদের কারো বাসায় ঝি চাকরের কমতি নাই। রামকিঙ্কর ছিল অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের। আমাদের আর্ট কলেজ ছায়ানট সংগীত ভবনে কি ঝি চাকর শ্রেনীর ছেলে মেয়েরা ভর্তির সুযোগ পাবে? পাবে না। যদ্দিন পাবে না তদ্দিন পহেলা বৈশাখের লালপাড় সাদা সিল্কের তলে লুকানো প্যান্টি ব্রা মুলত মোল্লার বৌদের বোরখা কেটে বানানো।॥

॥ মোল্লরা যখন দেহ ও আত্মাকে পৃথক করে প্রাণের আকুতিকে গুম করছে পর্দাপ্রথার আড়ালে। বাংলা নাট্যসরণীর বিজ্ঞাপনি এজেন্টরা তখন রাস্তায় রাস্তায় স্কুলে স্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কচি কচি চেহারার ওপর বাজারী মেকআপ চড়াতে।॥

॥ সাবান শ্যাম্পুর বৈচিত্র অবশ্যাই দরকার। তার আগে দরকার বস্তিবাসিদের বিছানা বালিশ খাদ্য চিকিৎসার বন্দবোস্ত। এ বন্দবোস্ত করা হবে না। কারন প্রাথমিক মৌলিক চাহিদা পুরণ হলে ফুটপাতজিবীরা এপার্টমেন্ট গড়ার ইট না ভেঙ্গে এপার্টমেন্ট ভেঙ্গে যৌন বৈচিত্র্যের স্বাদ চাইবে।॥

॥ সমাজ পুরোহিতেরা যৌনমুক্তি যদ্দিন পারে ঠেকিয়ে রাখবে। যৌনমুক্তি এসে গেলে মানুষ ক্ষুদ্র বস্তুগত স্বার্থে একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রাজি হবে না।॥

॥ সংবাদ পত্র পত্রিকা রাজনৈতিক পার্টি ধর্মসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপ যদিও তুলনামূলক তুমি খারাপ আমি ভাল তর্কাতর্কির মুখোশ আটা, প্রকৃত অর্থে এ প্রতিষ্ঠানগুলো আজতক একটি সম্মিলিত উদ্দেশ্য নিয়োজিত তা হলো ব্যক্তির বহুগামিতা তথা যৌন স্বাধীনতা বিকাশে প্রলম্বিত বিধিনিষেধ আরোপ ও তা প্রয়োগে পারস্পরিক নীতি নির্ধারণ। বিশ্ববিদ্যালয় যখন একজন ছাত্রকে রুটিন ছকে ঢুকাতে ব্যর্থ হয় বা ধর্মসংঘ যখন একজন টার্গেটকে পাথর ছুড়ে মারতে ব্যর্থ হয় তখন ধর্মসংঘ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসাবে সংবাদ মাধ্যম স্বতত তৎপর হয়ে তৈরী করে স্ক্যান্ডালাস প্রতিবেদন। বিভিন্ন মেরুর রাজনৈতিক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য এ তিন প্রাতিষ্ঠানিক সাপের লেজ হিসাবে কাজ করে।॥

॥ গনপিটুনিতে কথিত অপরাধি হত্যা, বিনা বিচারে জেলহত্যা এদেশের অনেকদিনের রেওয়াজ। সে রেওয়াজটিকে এখন ধারণ করেছে গন সাংবাদিকতা।॥

॥ সংবাদ মাধ্যম যে কত কদর্যভাবে জনমত প্রভাবিত করতে পারে এবং সে প্রভাবের চাপে বিচার ব্যবস্থাকেও বিকৃত করে তুলতে পারে তার প্রমান কিছুদিন আগেকার রাষ্ট্র বনাম হোসনে আরা খুকু মামলা। উক্ত মহিলা বিবাহিত ছিলেন। একজন নরহত্যাকারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মহিলার বিরুদ্ধেও খুনের পরিকল্পনা ও সহযোগিতার মামলা দায়ের করে। সংবাদপত্রগুলো তখন ঐ মহিলা ও তার দোসরের নিভৃত

প্রেমের ছবি ছাপিয়ে তাদের কাটতি বাড়ানোর পাশাপাশি জনমতকে রক্ত পিপাসার চরমে পৌঁছে দেয়। ফলশ্রুতিতে বিচারের বাদি হয়ে ওঠে বিভ্রান্ত। হত্যাকারী বন্ধুর সাথে এ মহিলা হন মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত। পরে উচ্চতর আদালতে আপিল করে বেকসুর খালাস পান। এই যে বিচার ব্যবস্থার চরম বৈপরিত্য এর পিছনে অর্ধশিক্ষিত সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকাকে দায়ি করলে কি ভুল করা হবে ॥

॥ খুকুর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলে কোন সাংবাদিক কি তার নৈতিক দায়িত্ব বহন করতেন?॥

॥ কে কার সাথে সহবাস করবে আর করবে না এটা অবশ্যাই গোষ্ঠি ঠিক করে দেবে না। যৌনমুক্তির কথা উঠালে ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারী বলা হচ্ছে। যাতে তাকে সামাজিক হুমকির সম্মুখিন করা যায়। এরপরও দমিত না হলে মোড়ের পাগল আখ্যা দিয়ে ব্যক্তিকে বাস্তুভিটা ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে।॥

॥ যৌন বৈচিত্রের অধিকার যেমন ব্যক্তির প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার তেমনি যৌনতা পরিত্যাগও তার মানবিক অধিকার। কোনটার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ চাপ প্রয়োগ সামাজিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। রেড ইন্ডিয়ানদের ভিতর এইডস নেই। আবার রেড ইন্ডিয়ানরা সমকামীকে সমাজ থেকে বহিস্কার করে না তিরস্কারও করে না। দ্রষ্টব্য : নোবেল বিজয়ীনি পেরুভিয়ান রেড ইন্ডিয়ান রিগবার্তো মেঞ্চুর আত্মকথন।॥

১৬ ॥ বহু অমিমাংসিত প্লেগ রহস্যের মতো এইডস বিজানুও যে সমকামিদের শরীরে ড্রাগপুশারদের সিরিঞ্জে গোপনে রোপন করা হয়নি তার নিশ্চয়তা কি? আর গোপনে রোপনটা করলো কে?॥

॥ যে দেশে কলেরা ডায়রিয়া বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় সে দেশে এইডস নিয়ে চিল্লাচিল্লি শুধু হাস্যকর নয় ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। ধর্মবিরোধী, জাতিয়তাবাদ বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী বর্ণবৈষম্য লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী তারুণ্যের বিরুদ্ধে এদেশেও কি এইডস ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে ?॥

॥ কোনটা বিকৃত - পার্কে রাস্তায় খোলামেলা চুমু নাকি চুম্বনরত প্রেমিক প্রেমিকাদের ভয় দেখিয়ে পুলিশের ট্যাক্স আদায় ? শুদ্ধবাদিরা বলবে দুটোই। বিয়ে দিয়ে দাও। হাহ্! বিবাহের লক্ষ্যটা কি? বিয়ে এমন এক ইউনিট যার প্রধান উদ্দেশ্য পুঁজির বিকাশে উৎপাদন ও সেবাক্ষেত্রে সক্ষম শ্রমিক সরবরাহ। মা বাবা এখানে সন্তানের বিকাশে সামাজিক নিয়ন্ত্রনের যৌথ এজেন্ট। সন্তান উৎপাদনে লক্ষ্যহীন শুধু আনন্দের জন্য যে যৌনতা তার বৃদ্ধি হলে ব্যাক্তির ওপর গোষ্ঠির নিয়ন্ত্রন হ্রাস পায়। এ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার ভারসাম্য ঠিক রাখতে উন্নত বিশ্ব এখন তৃতীয় বিশ্ব থেকে দৃষ্টান্ত যোগ্য রেডিমেড ছোট পরিবার আমদানি করছে। পরিবারতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে বিয়ে ইউনিটটিকে কৌশলে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মারমুখী ধর্মসংঘের ছত্রছায়ায়।॥

॥ যে সমাজের সামরিক শাসন বিরোধী অধ্যাপক কবিমন্ডলী হ্যাপির স্মরণ সভায় বাধা দেয় সে সমাজের বিচারক খুকুকে মৃত্যুদন্ড দেয়। যে সমাজের বিচারক খুকুকে বেকসুর খালাস দেয় সে সমাজের পরাবাস্তব মোল্লারাও তসলিমা নাসরিনকে নিগৃহিত করে।॥

॥ ছোটখাটো দলন এড়াতে এড়াতে আমরা মহাদলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করি ।॥

॥ নিরন্তর মুক্তিসংগ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া সকল বাঙ্গালিকে অভিনন্দন। কিন্তু আমি কিছুতেই '৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি চাইতে পারিনা। সবদিক খোলা রেখে সমস্ত সৃজনশীল সম্ভাবনার উন্মোচন হোক ।॥

॥ শুধু একটি মাত্র 'না', তা হিংসা ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে। বুঝেছি কি বলতে চান, কত কিছু করতে চান কোন বিধিনিষেধ মানতে চান না; তাহলে আর খুনোখুনিটা বাদ যাবে কেন? বাদ এজন্য যে এতে সৃজনশীলতা নেই বরং এতে ব্যক্তির সমস্ত স্বপ্নের অকস্মাৎ বিরতি ।॥

॥ সৃজনশীলতাকে খণ্ডিত শুদ্ধতার দৃষ্টিতে না দেখে দেখা উচিৎ ঐতিহাসিক সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে। এ প্রেক্ষিতে একটা এসিড টেস্ট করা যাক। যে লেখাটা লিখছি যে রাস্তাটা খুড়ছি ঃ ১০০০ বছর পর এ লেখাটার শব্দ বাক্য না পাল্টে মূল অর্থটাকে সময়োপযোগী করে নিতে পারব? হাজার বছর পরের উপস্থাপনায় শুধু ছোট্ট একটি এসিড পোড়া জন্মদাগ থেকে যাবে, সে দাগ আকৃতি পাবে কোন জাতিস্মরের প্রাতিস্বিকতায় ঃ সর্বসাধন সিদ্ধ হয়, তারা ভাবে মানুষ গুরু নিষ্ঠাবান ।॥

রোকন রহমান

মেঘের জর্নাল . প্রথম



ভদ্রলোক মানে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। শিক্ষিত মার্জিত মানসম্পন্ন উঁচু দরের মানুষ। ঝামেলামুক্ত মসৃণ নরম জীবনের পথে কেবল সিঁড়ি ভাঙা মানুষের দল। ভদ্রলোকদের সমস্যা সংকট সম্ভাবনা মানুষের মতো নয়। কারণ তাদের নিজস্ব নিয়ম নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। এসব নিয়ম এসব ব্যাকরণ মানুষের সঙ্গে মেলে না। তাদের নন্দনকাননে নিচু মানের সমস্যা সংকটের প্রবেশ নিষেধ। শুদ্ধতাকামী কমনীয় নন্দনের বাগান বিলাসে ভদ্রলোকদের সমস্বরে উচ্চারণ - রাঁবো কেনো খ্যামবো?

বাঙলা ভাষাটা অমার্জিত অভদ্রলোকদের ভাষা। বাঙলা - ভূখন্ড ভাষা জাতি একটা আধখেচড়া প্রভু হাসানিয়া বিষয়। ভাষাটাকে ঝকঝকে পলিশ করা চলছে প্রায় শত বৎসর তবু প্রায় সর্বদা ছোটলোকদের ভাষাটা তাদের বিরক্ত বিব্রত করে। মধ্যবিত্তকবিদের এই সমস্যা প্রবল। বাঙলা বর্ণমালার খ বা ক্ষ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে ভদ্রলোকদের প্রচুর অসুবিধা হয়। এ জাতীয় শব্দ বলতে শুনতে লিখতে দারুণ অসুবিধা। প্রথম সমস্যা উচ্চারণের। কন্ঠনালীতে খসখসে একটা অমার্জিত ঘর্ষণ হয়। গলাটা কেমন জানি খরখর করে। গলার কোমলতা নষ্ট হয় সুর নষ্ট হয়। গলার মিহি সৌন্দর্য কমনীয়তা, মেদো সুর - সব হারিয়ে যায়। কন্ঠনালীর কষ্টটা - আবার ইতর জাতীয়। এ ধ্বনিতে রুক্ষতা প্রবল যা নন্দনের প্রধান শত্রু। পারত পক্ষে ভদ্রলোকেরা এটি উচ্চারণ করে না। দ্বিতীয়ত: খ বা ক্ষ র জাতটা নিম্ন মানের। একটা অভদ্র অভব্য অশালীন শব্দ। শব্দটা অশৈল্পিক অমার্জিত রুচিহীন কতক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সঙ্গে খটখটে চাষা চাষা মুর্খমুর্খ বিষয় জড়িত যা উচ্চারণের রুচিশীল মানকে নষ্ট করে ।

ভদ্রলোকেরা এ শব্দটা লিখতে গেলে আরো সমস্যায় পড়ে। এর সঙ্গে যাবতীয় নিচু শ্রেণীর বাক্য সমস্যা সংকট ও নিম্নমানের সব যোগ এবং যোগাযোগ আর এই সব প্রচন্ড বিরক্তিকর। কতক উদাহরণ দেয়া যায় - খরা, খবিস, খচ্চর, খটকা, খটমট, খড়, খড়ি, খড়গ, খন্তা, খর্ব, খল, খাদ্য, খাদক, খানকি, খানসামা, খামচি, খারাপ, খিঁচুনি, খিচখিচানী, খিচর, খিদা, খাটাশ, খুন, খুনী, খিস্তি, খেকো, খ্যাপা ইত্যাদি। এমত প্রচুর অপছন্দের শব্দ আছে, 'ক্ষ' উচ্চারণে। যদিও ক্ষ হচ্ছে ক ও ষ মিশ্রিত বর্ণ। ক্ষুধা, ক্ষয়, ক্ষতি, ক্ষমা , ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, ক্ষুব্ধ ইত্যাদি উচ্চারর্ণে গলার ক্ষতি হয় ।

এর বিপরীত চিত্র ও আছে। র জাতীয় শব্দ উচ্চারণে ভদ্রলোকদের আরাম বোধ হয়। ভদ্র লোকদের নিজস্বশ্রেণীর এই শব্দটি নান্দনিক এবং মার্জিত ও পরিশীলিত। র-এ একটা কোমল মিহি মিষ্টি মাধুর্য আছে। যে কোন ভদ্রলোক র এর উচ্চারণে সাবলীল স্বচ্ছন্দ। র বলতে লিখতে শুনতে কোন কষ্ট হয়না - শ্রম নেই তেমন। যা-ও আছে তা গলাকে আরো পরিশীলিত করে। যে কোন ভদ্রআয়োজনে এই শব্দটা প্রায় রাজসিক মর্যাদা পায় এবং তার নাগরিক মান ও উঁচু। র উচ্চারণ স্বস্তিদায়ক তো বটেই র সম্পর্কিত তাবৎ উৎপাদন ও মজার। বিষয়গুলো আরামদায়ক সফিস্টিকেটেট - অনায়াসেই হেসে খেলে বলা যায়। শব্দটি অভিজাত নান্দনিকতার সকল মুদ্রার কেন্দ্রিক। সুতরাং আধুনিক নাগরিক, ভদ্রমধ্যবিত্তপন্ডিত সকলেই র ভালবাসে। র দ্বারা গঠিত বাক্য বাংলা ভাষার সফলতম সম্পদ। এতে গলা মোলায়েম হয়। কণ্ঠনালীর কোমলতা বৃদ্ধি পায়। র এর সংগে শিল্প সুষমামন্ডিত বিষয়ের মধুর যোগ এবং যোগাযোগ যার অধিকাংশ ভদ্রলোকদের অতি উপাদেয়। যেমন - রস, রসিক, রসময়, রমনী, রমা, রবি, রতি, রঙ, রূপ, রাত, রাধা, রহস্য ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুত বাংলা বর্ণমালায় ভদ্রলোকদের আস্থাভাজন এই র ধ্বনি না থাকলে বহু পূর্বেই ভাষার শর্বনাশ ঘটতো।

এ কারনেই ভদ্র নাগরিককবি ক্ষেপে যান -

র‍্যাঁবো কেন খ্যামবো?

যিনি একশো বছরের পুরাতন র‍্যাঁবোকে খ্যামবো বানিয়েছেন তিনিও ভদ্রলোক এবং র শ্রেণীর বলে র ভালবাসেন। করতে পারা বা ট্র্যাকে আসা অথবা অভ্যাস বদলের দায়িত্ব নিতে গিয়ে এমন বিব্রত হতে হবে তিনি ভাবেননি। আর দুর্ভাগ্য ফরাসি ভাষার (নাকি বাংলাভাষার!) - ফরাসিদের R এর নিরঙ্কুশ উচ্চারণে র হ খ এর মিশ্রনে আপাত স্থিতি দেয়া যায়। তাও যুৎসই নয় যা কাশের রোগীর মতো শোনায় -> এ্যা--খ !

র‍্যাঁবো বা খ্যামবো বা র‍্যামবো জটিলতা আপাত এই ভাবে খেলছে খেলাচ্ছে।

ভ্যান গগ উঁচু দরের শিল্পী। শিল্প মূল্য একশো কোটি টাকা।
তার পূর্বে ভ্যান গগ সামান্যতম কানকাটা -
ব্যর্থ প্রেমিক আবেগি মানুষ।
হলুদ বিপ্লব কিংবা প্রিয়তম থিও কে লেখা চিঠি পড়ে মানুষ বুঝলো ভ্যান গগ বহু উঁচু মার্গের শিল্পী - একথা শুনে চটে যান শিল্পী বন্ধু!

এবং সে-ও বলতে পারলো না ভ্যান গগ, ভ্যান গহ, ভ্যান গঘ, ভ্যান গখ কোনটি একশো কোটি টাকার প্রকৃত শিল্পীর নাম?

নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি .....

সংজ্ঞা নির্ধারণ জরুরী। পুনরায়। অথবা সংজ্ঞা উৎপাটন। নচেৎ সংজ্ঞা ধর্মীয় বাণীর ন্যায় ক্রমে অলঙ্ঘনীয় এবং ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বারবার ধারকরা সংজ্ঞা, ধার করা নিয়ম শৃঙ্খলা -আরোপিত ব্যাকরণ, আমদানিকৃত সাবানের দোকান দিনদিন মূঢ় উল্লাসের বৃত্ত উৎপাদন সহ কূয়ার ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। একদা বর্বর ছিলাম। সভ্যরা - লাল চামড়া এসে অক্ষরজ্ঞান দিল, ধরিত্রীজ্ঞান দিল। বৈঠক খানা থেকে শয়নঘরে গুরুদীক্ষা নিলাম। প্রথমে মৃত্তিকা, তারপর বনভূমি, তারপর শষ্যকণা, তারপর ঘরদোর তারপর রক্ত বিক্রি করলাম। শুয়ে পড়লাম উঠতে গিয়ে দেখি মেরুদন্ড নেই। সব ফকফকা! জলদস্যুদের ক্রীতদাস রূপে এখনও সদম্ভ উচ্চারণ উচ্চকিত আমাদের। সভ্যতা মানে পশ্চিম। মানা যায়? তবে সভ্যতা মানে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, খুন, নীলরক্ত, আত্মসম্মানহীন, মানুষকে পণ্য বানানোর আত্মমর্যাদাহীন ক্রীতদাস মনন নয়। এসব নৃত্য এখন নূতন ভূমিকা দাবী করে - প্রাপ্তির লক্ষ্য নেই - সুতরাং প্রাপ্তির যাত্রা শুন্য। আর প্রাপ্তি মানে মনে স্থুল মোহ - ব্যক্তি কেন্দ্রিক অমরত্বের স্বাদ সর্বাংশে।

২০ অধুনা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় - পরিবেশ আর নিজস্বতার শেকড় সন্ধান পর্ব। সকল ক্ষেত্রের মতো এখানে ও পশ্চিমাদের সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি প্রধানতম ধারা। সভ্যতার দাঁড়িপাল্লা ওদের হাতে। ধনতন্ত্রের নিচুমানের সংকট, তথাকথিত সাম্যবাদের রসকষহীন জীবন ধারায় বিরক্ত মানুষ শূণ্যহাতে ঘরে ফেরে। দেয়াল ভাঙে, যুদ্ধ করে, ব্যবসা করে। তবু ও একটা ফাঁক বা অন্তসার শূন্যতা ঘিরে থাকে আধুনিক নাগরিকের। সুতরাং বিকল্প শান্তি বা সুখ একটা আশ্রয় চায় - সাময়িক সান্তনা চায়। ধর্মের দিকে একাংশ - একাংশ নিজস্ব ঐতিহ্য সন্ধানের দিকে যায়। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ প্রবল শক্তিতে নিজেদের শেকড় সভ্যতা সংস্কৃতি সহ দাঁড়িয়ে যায়। এই সব অস্থিরতায় নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বের আত্মশ্লাঘা ঘোষনা করে। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধতর ধারা পেয়ে গেল পশ্চিমা স্বীকৃতি। অনেকটা ষাটের বীটনিক ধারা যা আমাদের হাজার বছর পুরাতন সম্পদের নব্য রূপ দেয়ার মত। ব্যাস পুনরায় চিৎকার ওঠে - ঐতিহ্য, সংস্কৃতি। এবং পুনরায় চর্বিত চর্বন মুর্খতা। শেকড় হাতরানোর দল নিজের শেকড় পায় না, অন্যের লেজ ধরে নিজের শেকড় ভাবে। দু'জন দেবতা থাকে, তা-ও প্রাকৃত নয়।

কাদের শেকড়, কারা মৃত্তিকার, কারা নিজস্ব?
পুনরায় মুর্খতার প্লাবনে হাবুডুবু!

সরকার মাসুদ

কবিজীবন, অকবিজন্ম

যশ প্রার্থীর কবিজীবন

শনির আখড়ার সেই কুঁড়েঘর সেই গোল ডোবার কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে। কুঁড়েঘরটায় বাদশা থাকতো। সে তখন কয়েকটা পিচ্চিকে পড়ায়। তার আর কোন জীবিকা নেই। পাশের একটা বাড়ি থেকে খাবার আসে। টিফিনক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে প্রায় দুপুর বেলা উঁকি দিলো ছোট্ট মেয়ে। কি খুকি, তোমার নাম কি? শিশুটি খাবার রেখেই দে দৌড়। বর্ষায় পানি চলে আসে একদম ঘরের চৌকাঠে। কাঁচা স্যাতসেঁতে মেঝে। তার উপর হোগলার পাটি পাতা। তার উপর উবুড় হয়ে বসে বাদশা শিশুদেরকে পাঠ দেয়। একদিন রাত পৌনে একটায় গিয়ে হাজির। বাদশা আছে। লাইট জ্বলছে। লাইট তো না বড় সাইজের আলোফল ঝুলে আছে মাথার উপর। রাত আড়াইটা পর্যন্ত একথা-সেকথা, কবিতা প্রসঙ্গ, বাদশার বাড়ির কথা, ভাটিখানা, ময়মনসিংহের মাগীপট্টিতে মালটানার গল্প, আরো কত কি ? ঘুম থেকে উঠলাম বেলা দশটায়। দেখি শিশুরা বইখাতা বগলে চলে যাচ্ছে। নড়বড়ে চৌকির পায়ের কাছে সেই টিফিন ক্যারিয়ার। বাদশা নাস্তা এবং দুপুরের ভাত একসাথেই খায়। খেয়ে উঠেই তামুকের পুটলি বের করবে। এরপর দুপুর থেকে বিকেল টানা ৪/৫ ঘন্টা নেশাঘুম।

ছোট্ট গোল পগারটায় বুক পানি। চারপাশে লম্বা ঘাস। দুচারটা কলমির মাথা উঁকি দিচ্ছে। আর অজস্র গুগলিশামুক। ফলে হাঁস আসে। হাঁস এবং বাদশা উভয়েই বহুদিন ঐ ডোবায় গোসল করেছে। আর ঐ খাটাপায়খানা কি ভোলা সম্ভব? নিচ দিয়ে প্রবাহিত পোকা থিকথিকে, জামরঙ গু-এর নদী। প্লাস্টিকের বদনা হাতে আমি চলেছি গোড়া ডুবে যাওয়া ধানগাছের অরণ্য ঘেঁষে, কাদাপানিতে গোড়ালি ডুবিয়ে।

বাদশাকে একদিন তরুন কাব্যলিখিয়েদের মাঝখানে আবিষ্কার করলাম। দলের মধ্যে বসে মেলা বাখোয়াজি করছে। কাঁধে চমৎকার রঙজ্বলা ব্যাগ। থেরেলমার্কা ঢোলা জামা প্যান্ট। আমরা অদূর থেকে লক্ষ্য করছি বাদশা কবি হতে চাইছে। পুরোদস্তুর কবি। কিন্তু তার কবিতা কোথায়? আ-হ্যাঁ, একদিন দেখা গেল ছোট কাগজের পাতায় একজোড়া ছোট কাব্য, বেশ বেশ। এরপর একদিনের জন্যও সান্ধ্যআড্ডা মিস করেনি সে। মাঝখানে বাদশার কিছু দিন খুব ঘটনাবহুল। কবিতার প্রতি ইলিইলি করা এক কিশোরীর সাথে তার অপ্রেম। পর পর ক'টি লিটল ম্যাগে সরব উপস্থিতি। জনৈক কবির নানকের সংস্পর্শে এসে মস্তক মুন্ডন। ঈদের মাসে মানে ফেব্রুয়ারীর সাহিত্যমেলার স্টলে বসে নীরবতা পালন। বাদশা, নানক কোথায় ? একটু পরে দেখলাম স্লিপে লিখেছে, পনের মিনিটের জন্য বাইরে গেছেন, অপেক্ষা করুন। মেলা শেষ আবার ডাক্তার আর রোগীদের প্রাঙ্গণে আমতলায় আড্ডা। বাগানের সাবেক গোল আড্ডা জমজমাট। ধুন ফুন চললো কয়েক দফা। রাত দশটার পর একে একে উঠে যাচ্ছে সবাই। একি! বাদশা ঘাসে শুয়েই আছে। তারাদের দিকে মুখ। কথা নেই। বাদশা ঘাস থেকে কোনদিন উঠবেনা মনে হচ্ছে।

এরকম জীবনযাপন সত্যি ইন্টারেস্টিং এবং মারাত্মক ছোঁয়াচে। একবার শ্যামল আর আমি পাঁচুরিয়া জংশনের সামান্যতা, তার চৈতী নৈঃশব্দের হাহাকার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভ্রমণফেরত শ্যামল তো চড়াইকোল স্টেশন নিয়ে কবিতাই লিখে ফেলল। চমৎকার কবিতা, *চড়াইকোলকে চেয়েইছিলাম .. চড়াই চঞ্চলতার ভোর ...* ইত্যাদি। লোকাল ট্রেনে কুষ্টিয়া ভ্রমন শেষে আমি ভেবেছি অন্য কথা। পাংশা স্টেশন বাজারে ছইঅলা একঘোড়ায় টানা ভ্যান দেখলাম। জোলার গল্পে এরকম বাহনের বর্ণনা আছে। স্বাস্থখারাপ মুখভার ঘোড়াগুলো ঐ ভ্যান নিয়ে ঝোপ ঝাড়ময় রাস্তা পার হয়ে কোথায় চলেছে? ঐদিকে সারি সারি কাঁটাগাছ। শুধু যাত্রীদের মাথার ভিতর হালকা হালকা বরফ পড়তো যদি। ভ্রমনবৃত্তান্ত শুনে লাফ দিয়ে উঠলো বাদশা। আমিও যাবো আপনাদের সাথে সরকার ভাই।

একদিন আমরা লক্ষ্য করলাম বাদশা নেই। বাদশা অনেকমাস কবিতা লিখিয়েদের দলে অনুপস্থিত। একটার পর একটা ছোট কাগজ বেরিয়ে যাচ্ছে। সেসবের পাতায় বাদশার ছোট কাব্য কই ? এক নেশানিবিড় সন্ধ্যারাতে শোনা গেল বাদশা ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের দেশে গেছে। কারন সে ইফং-ফং-ফং খেলা ভালবাসে। আমার মাথায় ভেসে উঠলো শনির আখড়ার সেই কুটির, সেই গোল ডোবা। ময়লা কালিঝুলিকীর্ন তাকে অল্প কিছু বই পত্র পত্রিকা এলোমেলো। বাঁশের আলনায় স্তুপ করা জামাকাপড়। পাশেই ঝুলন্ত ময়লা এত লম্বা পানজাবিটা কার ? ঠাকুরগায়ের সেই ছেলেটির নাতো। ঘামচিটচিটে কভারহীন বালিশে হেলান দিয়ে দুপুর বেলা আমি একটা মাকড়শার ফাঁদ দেখছি মন দিয়ে। বাদশা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তীক্ষ্ণ নাক এবং খাদে নেমে যাওয়া চোখের অভিব্যক্তি অচেনা। ভাবছিলাম এমন লাইফস্টাইলের পাশাপাশি একটিমাত্র মারখাইরি কবিতা বই রেখে যেতে পারলে, খেলা। ঠিক তখনই বাদশা বলে উঠলো, কবিতা আসেনা যে সরকার ভাই।

মঙ্গলাচরনের বোরহেস

আমাদের সময়ে কয়েকজন মঙ্গলাচরন দেখা দিয়েছেন। চল্লিশের মঙ্গলাচরন চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে আছে? তিনি কবিতা লিখেছেন কিন্তু কবি হতে পারেননি। পান্ডিত্যগর্ভ মননদীপ্ত একাধিক ভাষায় পারদর্শী এই মানুষটি কিছু সফল অনুবাদকাজের স্রষ্টা। শুরু যৌবনে আমার কবিকিশোর চৈতণ্যের ঝুঁটি ধরে হেচকা টান মেরেছিল তার অনুদিত র‍্যাঁবোর *নরকে এক ঋতু*, *Drunken Boat* তো পড়লাম আরো অনেক পরে। নয়া প্রজন্মের তরুনতর সাথীরা ঐ বইটি কি দেখেছেন? ব্যক্তিগত ভাবে অনুবাদের কাজে আমি মোটেই আগ্রহী নই। তারপরও দু/চার/পাঁচ লাইন ট্রানশ্লেট করতে হয়েছে। সেটা প্রবন্ধের স্বার্থে নিরুপায় হয়ে। যিনি মাল লেখক তার কবিতার ধ্বক অবশ্য অনুবাদেও টের পাওয়া যায়। প্রকৃত কবিত্ব অনুবাদে হারিয়ে যাবে না। প্রমান কাভাফি, টেড হিউজ, লোরকা নাজিম হিকমত আরো আছে। তবে কথাও আছে এখানে। অনুবাদককে, সম্ভবত, শুধুকবির চেয়ে যোগ্যতর হতে হয়। অথচ অন্যের কাব্যকলার তেলেসমাতি মাতৃভাষায় আনতে হলে মাথায় যে পরিমান আলো থাকা দরকার আমাদের মঙ্গলাচরনদের তা নেই। এক দুজন বিরল ব্যতিক্রম আছে বোধ হয়। তাই এখন পর্যন্ত একটিও পূর্ণাঙ্গ কবিতা লিখতে পারেনি, কেবল চিকন চশমার ঝলকানি আর ভূয়া ভাবভঙ্গির বেলোয়াড়ি ইমেজের উপর দাড়িয়ে আছে এমন যুবকও এখন সাহিত্যের সম্পাদক।

আবার অন্যরকম চরিত্রও দেখতে পাচ্ছি। যেমন বিশু দাস। মাঝে মাঝে বাজার হালে থাকে। মাঝে মাঝে থাকারই জায়গা নেই। কবিতা লিখেছে কখানা। সাহিত্যের কাগজ সেগুলোর কিছু কিছু সগৌরবে ছেপেছেও। তা ছেলেটির বুদ্ধি সুদ্ধি ছিল। শুধু শুধু ভুল আবর্তে ঘুরপাক খেল কিছুমাস। কাউবয় লাইফ যাপন করলে কবিতার লাভ কতটুকু? আদৌ কি হয়? একদিন সকালে ওর ভাড়াঘরে গিয়ে হাজির। এ্যাটাচড বাথ থেকে স্নান করে বেরোনোর পর চোখে মুখে ফ্রেস বিষাদ। এটা ওটা অনেক আলাপ হল। বিছানায় বসে দুদফা চা সিগারেট চলার পর বালিশের দিকে আমার দৃষ্টিযোগ আকর্ষণ করে বললো, আমার মাথার কাছে বোরহেস, আমি ওর মাপের কবিতা লিখতে চাই। বললাম, বিশু, তোমাকে এখানে কেউ বুঝতে পারছে না। কলকাতা চলে যাও। কফিহাউস আছে। পদ্য নিয়ে ইয়ার্কি মারা চ্যাংড়ারা আছে। ওখানে তোমার সুবিধা হবে। বিশু অবশ্য মঙ্গলচরনদের দলে নেই। কেবল জনৈক মঙ্গলাচরনকে একবার বোরহেস ধার দিয়েছিল অনুবাদের জন্য। মজার বিষয়, মঙ্গলাচরনদের কেউ কেউ অদ্ভুত হীনমন্যতায় ভোগেন। সেদিন একজন তার অফিসে আমাকে বললেন, না বস, আগে কবিতার বই। তারপর অনুবাদ বের করবো। তাহলে কি দাড়াচ্ছে? যিনি কবি তিনি মঙ্গলাচরন নন। সফল অনুবাদক কদাচিৎ কবি। তাইতো এক সন্ধ্যার শাহবাগে দেখলাম জনৈক মঙ্গলাচরনের হাতে পড়ে মহান বোরহেসের সেকি লজ্জা!

ভ্রমনের কবিতা, সমুদ্রের কবিতা

কৈশোরে আমার খুব ভালো লেগেছিল আবুল হাসানের এই লাইনটা : *এ ভ্রমন আর কিছু নয় কেবল তোমার কাছে যাওয়া।* এখন হিসেবী মুগ্ধতার সৃষ্টি পর্যায়ে পরিনত মস্তিকে ভেবে দেখি ঐ পঙক্তিটির মূল্য। ষাটদশকী আঙ্গিকে সহজ দার্শনিকতার ছায়া পড়েছে এখানে। তারচে বড় কথা এ ধরনের উচ্চারণ কম্যুনিকেশনের জন্য সুবিধাজনক। হাসানের জনপ্রিয়তার একটি কারন ঐ জাতীয় বাণীভঙ্গির বিশিষ্টতা। গোড়ায় ফিরে যাই। ভ্রমন। ভ্রমন এবং নিসর্গচিন্তা আমার কাব্যের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। ভ্রমন আর অচেনা রাস্তার চিরআবৃত রহস্যে আমি স্থাপন করতে চেয়েছি মানুষের বিশাল জীবনবেদনা, মানুষের সামান্য সুখের অসামান্য বর্ণালী। কেন দুধজ্যোৎস্নায় আমি ভাঙ্গা সাঁকোর উপর ময়ুর পালক দেখেছি, পানির রেখার একটু উপরে ভাঙ্গা তবলার খোল, বেহালার মাটি খাওয়া-ছড় পড়ে আছে কেন আমার কবিতায়, তার কারণ ব্রিজ আমার কাছে মিলনের নয় বিচ্ছেদের প্রতীক। ব্রিজ কৃত্রিম বরং খেয়াঘাটই প্রাকৃতিক। সভ্যতা আমাদের কতো প্রাকৃত সৌন্দর্য হত্যা করেছে কে জানে। ***জলমগ্ন পাঠশালা'র*** মতো গ্রামঐতিহ্যের শিকড়স্পর্শী নাম কটা কবিতার বইয়ের আছে? আমার প্রথম বইয়ের প্রথম কবিতা ***আবহমান উলুধ্বনি***। হায় সেই উলুধ্বনি নদীর ঘোলা স্রোতে ভেসে কোথায় গেছে। নাহলে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলে গায়ত্রীরা আজ উলু দিচ্ছে না কেন?

সমুদ্রভ্রমনফেরত মানুষের অসুখ সত্যি দুরারোগ্য। প্রথম যেবার রিফাত চৌধুরীসহ সমুদ্র দর্শনে গেলাম, কক্সবাজারের সৈকতে বসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার মনে হলো সমুদ্র নিয়ে কবিতা লেখা কতো কঠিন। আমি সমুদ্রের কবিতা আবার লিখতে পারবো তো? হ্যাঁ লিখেছি। ফিরে এসে এবং অনেক পরে কয়েকবার সমুদ্রবিষয়ক অন্যমনস্কতাকে আমি ধরেছি আলো আঁধারি ভাষায়। পোটকা মাছ, জেলি মাছ, সমুদ্র মাগুর, ঘোড়া মাছ, সমুদ্রসুলতান নিয়ে কবিতা লিখতে পেরেছি

লিখে
ক্ষতাকে আমি ধরেছি আলো আঁধারি ভাষায়।
পোটকা মাছ, জেলি মাছ, সমুদ্র মাগুর, ঘোড়া মাছ, সমুদ্রসুলতান নিয়ে কবিতা লিখতে পেরেছি

আমি। কাঁটাগাছ, পরিত্যক্ত রেলপথ, অবহেলা হারিয়ে যাওয়া রাস্তা, প্রেমিক শীলমাছ, মৎস্যকন্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আমার কাব্যপ্রচেষ্টা পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন। হাঙর, এই ভয়ংকর রূপবান সমুদ্রপ্রাণী আমার খুব প্রিয়। এখন আবার নাকের সর্দিতে, ফুসফুস কাটে পড়ে ভিটামিন হিসেবে খাচ্ছি হাঙরের তেল।

ওয়ালকট মহাশয় তো সমুদ্রপুরাণ লিখেই বিখ্যাত হলেন। তার খ্যাতির পিছনে আছে মহাসমুদ্রকে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও দূরত্বজ্ঞাপক বাস্তিনেসের পটভূমিতে দেখে পর্যবেক্ষণ করার এক প্রবল ব্যক্তিগত ভঙ্গি। অথচ বাঙালি কবিদের সমুদ্রভাবনায় খালি উচ্ছ্বাস, খালি পোষাকী মুগ্ধতা; সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা তাই হার্টক্রেনদের সাহসে কুলোয়, বাঙালী কবি বড় জোর খোঁজেন ঘুমের বড়ি।

ভাবতে ভালো লাগে রিফাত চৌধুরী এবং কাজল শাহনেওয়াজ আমার দুই কবিবান্ধব তাদের নিজস্ব সৃজন ভাবনার মূল স্রোতের বাইরেও ভ্রমন নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন। কাজলের সাম্প্রতিক মোহনা বা চরস্টাডির মধ্যে যে জীবনবাস্তবতা ঈষৎ অস্পষ্ট ভাঙ্গিতে প্রকাশিত সেটা ভ্রমনেরই ফসল। আহমেদ মুজিব যখন করল্লাক্ষেতের পাখি নামে কবিতা লেখেন সেটাও এক হিসেবে ভ্রমনের কবিতা। বাসের জানালায় বসে সেই পাখি আমিও দেখেছি। যেন সেই ছোট্ট নাসবুজহলদে পাখি করল্লাক্ষেত ছেড়ে কোথাও যায় না, যাবে না।

২৪ নিভৃতিচর্চা বিকল্পচশমা

আমার নিমআগ্রহে, মূলত: আমার এক কবিকিশোর ছাত্রবন্ধু আজাদ ওবায়দুরের প্রচন্ড উৎসাহে বেরিয়েছিল চটি কাগজ ***চশমা*** (১৯৯২)। আমি তখন ঘোড়াশাল কলেজে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে ঐ এতটুকু কলাপাতায় আমি সমসাময়িক সাহিত্যচর্চার ভিতরের দলাদলি এবং ভন্ডামির চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তারও আগে ১৯৯০ ও ৯১ সালে নিভৃতিচর্চা নামে একটি কাগজের পর পর দুটি সংখ্যা বেরোয়। কাছাকাছি সময়েই বেরিয়েছিল কাজল শাহনেওয়াজ সম্পাদিত ***বিকল্প কবিতা***। শেষের দিকে অমিতাভ পালের চটিপত্রিকা ***ব্রহ্মপুত্র***। যে সহজ কবিতার কথা আমরা এখন বেশ জোর দিয়েই বলছি তার যাত্রা শুরু নব্বুইএর গোড়া থেকে। আশি দশকের প্রথম দিকে প্রকাশিত আমাদের কবিতাগুলোর বেশীরভাগই কতো জটিল! কল্পনার অশোধিত আবেগের সেকি মুগ্ধ আয়োজন ! ধীরে ধীরে আমরা অনুভব করলাম বিকল্প কবিতা পদ্ধতির প্রয়োজন। আসলে বিকল্পচশমা পরে ছিলাম আমরা সবাই। বাইরে যতই পার্থক্য থাক, কাব্যরীতিতে বা জীবনযাপনে, সাহিত্যিক আড্ডার ছলে জমে ওঠা নেশার নির্জনতা ভেঙ্গে একসময় যতই লিপ্ত হইনা কেন বাকযুদ্ধে, আমরা প্রত্যেকেই নিভৃতিচর্চায় আমূল বিশ্বাসী। নাহলে আমাদেরই সমসাময়িক অন্যান্যরা আমাদের কতিপয়ের ভ্রমন, নেশারীতি, সর্বোপরি কবিতার স্টাইল দ্বারা আক্রান্ত হবে কেন? কারো কারো শব্দমুখোশের আড়ালে ধরা পড়ে যাচ্ছে নাকি আমাদেরই কবিতার নিজত্বমুদ্রিত ঢং, উপমাকৌশল, প্রিয়মুদ্রাদোষসমুহ? এটা ঠিক আত্মশ্লাঘা নয়। পৃথিবীতে অপ্রচল রাস্তায় যে শব্দকোবিদের দল নিঃশব্দে হেটে গেছে তাদের ভিন্নতাকামী শিল্পরীতির অনড় বিশ্বাসে কোন খাদ নেই, কখনো ছিল না। অন্যের তৈরী করা পথে শোভাবৃক্ষের চারা লাগানো সহজ। দু'হাজার সাল পরবর্তী বাংলা কবিতা যদি সেই অদৃষ্টপূর্ব সারল্য ও সহজতা স্বাঙ্গীভূত করে নেয় তাহলে আমি বলবো

আমাদের কবিতা অনাগত প্রজন্মের জন্য সেই রাস্তার ভিত্তি করে দিচ্ছে। এই অন্তর্গূঢ় কল্পনাভাবনার মৌনমিছিলে আজ যারা শামিল তাদের মধ্যে অন্তত দু'একজন সত্যিকার কৃতীকবির সম্মান লাভ করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি নিজেও কি সহজ কবিতার সাধনা করছি না? কবিতায় কল্পনার বাড়াবাড়ি ভাবনার বেহিসেবী পোচ পোচ রঙ শব্দের বাহুল্য আমি পছন্দ করিনা দীর্ঘদিন। বক্তব্যের অনিশ্চয়তার কিংবা ধোঁয়াশে ভাবনার বিরোধী আমি। ছেলেবেলায় ছিপছিপে এক ধরনের জাপানী সাইকেল দেখেছি। যার পার্টসগুলো হালকাপাতলা কিন্তু খুব টেকসই। ওজন কম কিন্তু বস্তুগুন বেশী। নতুন কবিতা, আমাদের নতুন দিনের কবিতা হোক ঐ জাপানী সাইকেলের মতো।

সহজ কবিতাপ্রসঙ্গে আমার ফ্রস্টকে মনে পড়ে। রবার্ট লাওয়েল, ফিলিপ লারকিনের কিছু কবিতা আছে এরকম। তবে রবার্ট ফ্রস্ট এমনকি ভিক্টোরিয়ান টমাস হার্ডির কবিতায় যে ধরনের ভাবগম্ভীর নিবিড় সহজতা এবং সহনীয় অস্পষ্টতা বিদ্যমান তা খুব কম খ্যাতিমানের কাব্যকলায় পাওয়া যাবে। এতো গেল ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত। বাংলা কবিতাতেও সহজ কাব্যের যে কতোরকম আকৃতি প্রকৃতি আছে সেটা বিনয় মজুমদার, ওমর আলীদের কবিতা পড়লে বোঝা যায় কাব্যশরীরশৈলীতে জীবনানন্দের বারো আনা উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়েও প্রধানত বাণীর তাৎপর্যে একজন কবি কতো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেন বিনয় তার দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে ওমর আলীর বিবর্তন লক্ষ্য করুন। এদেশের লোকঐতিহ্য সংলগ্ন সুষমার সহজ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে একদা যার কাব্যযাত্রা শুরু হয়েছিল এখন তার কলমে দৃশ্যমুগ্ধতা নয় ঝরে পড়ে বঞ্চনাপীড়িত গ্রামবাংলার প্রাকৃত চালচিত্র। সম্প্রতি এই কঠিন পর্যবেক্ষণের সাথে ঈষৎ ছায়া, বাস্তবনির্ভর কবিকল্পনার যৎসামান্য কুয়াশা যুক্ত হয়ে তার রচনা এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে যাকে এ যাবৎ ব্যবহৃত কোন মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যাবে বলে মনে হয় না। কাব্যপ্রদর্শণীর মহানাগরিক বাগাড়ম্বড় থেকে ওমর আলী আজ বহুদিন স্বেচ্ছানির্বাসিত। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক। এবং তার লেখা পত্রিকা খুললেই আমাদের চোখে পড়ে না। এই দ্বিবিধ অপরাধে আমাদের পল্লবগ্রাহী সমালোচকগণ এবং সরব কবিবৃন্দ আর কতদিন তাকে কোনঠাসা করে রাখতে চাইবেন! এবার ভ্রমনে গিয়ে আমরা তাকে নিভৃতিচর্চায় মগ্ন দেখবো। আমাদের কবিতাবিশ্বাসের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হয়তো আমাদেরই বিকল্পচশমা পরে আছেন তিনি।

আমাদের কবিজন্ম

কোন এক আড্ডার মাঝখানে আবিদ আজাদ বলেছিলেন, তিনি কবির জীবন চান না। চান চিরসবুজ কবিতা। অন্য কেউ হয়তো দুটোই চান। ষাটের একদা নেশাজীবী কবিরা যখন মৃতজ্যোতিষ্কের শীতল গহ্বর মাত্র, তখন মুস্তফা আনোয়ার যার সাথে আমাদের বয়সের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বছরের, আমাদের সঙ্গে টানেলে চলেছেন গুটি গুটি পায়। এটা তার পক্ষেই সম্ভব। কেননা তিনিই একমাত্র ষাটের কবি যার কবিতায় অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য বিষয় আশয় খুব সরাসরি রগরগে ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঝুপড়িঘরের চটঝোলানো মদের দোকান, নেশাপান, আত্মঘৃণা, তামাশার মতো ফাঁপা শরীরসর্বস্ব প্রেমের সাবলীল মানবিকতা, চূড়ান্ত বিচ্ছেদ, সর্বোপরি তুঁতের প্রতীকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের বিষময় উপলব্ধি মুস্তফা আনোয়ারের আগে এত তীব্রভাবে আর কোন কবির রচনায় সাকার হয়ে ওঠেনি। এই অস্তিত্বদর্শণের মূল খুঁজতে গেলে হয়তো সেই শয়তান উপাসক অপ্রেমের কবি বোদলেয়রের কাছে ফিরে যেতে হবে। আপাতত

এই কবির জীবন যাপনের সাথে তার রচনার সাযুজ্য, তার সাহিত্য প্রত্যয়ের সাথে রচনাকৌশল যখন মিলিয়ে দেখি তখন সত্যিই মনে হয় কবির মতো জীবন যাপন কোন লেখকের জন্যই ঠাট্টার বিষয় হতে পারে না যদি তার ভিতরে থাকে প্রকৃত সৃজনপ্রতিভা, মাথার পিছনে থাকে পরিষ্কার জ্যোতি। আমাদের তরুণ বন্ধুরা, খ্যাতিপ্রার্থী নবীন কবিরা কি এই নিশ্চুপ নেপথ্যবাসী বিদ্রোহীর কবিতার সাথে পরিচিত? যারা নতুন কবিতা লিখতে চাইবেন আগামীতে তাদের **ভূত, *কোন ডাকঘর নেই*** নামের বইগুলো পড়ে দেখা কর্তব্য বলেই মনে করি।

এ মুহূর্তে সবচে প্রাগসর কবিতাগুলো বোধয় আমরাই লিখছি। আমার সাথে আছেন কাজল শাহনেওয়াজ, রিফাত চৌধুরী, আহমেদ মুজিব, বুলান্দ জাভীর, খায়রুল হাবিব প্রমুখ। আমার সর্বশেষ মনোযোগ স্থাপিত হয়েছে জনাব আহমেদ মুজিবের উপর। এই নিশ্চুপ অভিমানী কবি পুলিশের কান্নাকেও তার ব্যাক্তিবেদনার নেপথ্যভূমিকেও নিজস্ব রচনাভঙ্গির ছাঁদে ফেলে কবিতা করে তুলতে পারেন। যেমন রিফাত আনারস নিয়ে কিংবা কাজল পুরুষ মানুষের বিভিন্ন সাইজ নিয়ে আপাতউদ্ভট অথচ সফল কবিতা লিখতে পারেন। তেমনি বুলান্দের কবিতার আর্থবৈশ্বিক ভাবনা বাক্যের শিথিল বুনটের মধ্যেও যথেষ্ট সংহতি অর্জনে সক্ষম। আনন্দের কথা এরা সবাই আমার কেবল সহযাত্রী লেখকই নন, নিকটবান্ধবও বটে। না, আমি অতিরঞ্জনের অপকারিতা সম্বন্ধে রীতিমতো সচেতন। ষাটের কবিতার বিচিত্রসুর কোরাস এবং সত্তরের অকথ্য কাব্যদুর্ভিক্ষের পর রক্তশূন্য বুভুক্ষ কবিতার দেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য দুধরুটির জোগান দিয়েছেন প্রাগুক্ত ঐ লেখকেরা। তাই 'ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাক আমি ভাই আমার লেখার মূল্য বুঝে গেছি : তোমরা বোঝনি' - নেশাঘন কবিতাআড্ডার মাঝখানে মশকরার ছলে বলে ফেলা

শ্যামল সরকারের এই উক্তির নিহিত অর্থময়তা উড়িয়ে দেয়া চলে না।

আত্মপ্রবঞ্চক জনশ্রুতি দ্বারা চালিত না হয়ে সস্তা লোকপ্রিয় তার যাচাইকাঠিটি আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে ঠান্ডা মাথায় যদি চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, বাংলা কবিতার সাম্প্রত স্রোতে যে দু'চারটি উজ্জ্বল আলোকিত ডিঙ্গা ভাসমান ঘটনাচক্রে তারা আমাদেরই নিকটজন। এই নৈকট্য কেবল সামাজিক সম্পর্কের নয়, সৃজনভাবনা ও সৃষ্টি পদ্ধতিরও। ১৯৮৫ থেকে '৯৩ - ন'বছরে আমাদের এখানে অন্তত কয়েক ডজন যথার্থ ভিন্ন সুরের, ভিন্নভাবের কবিতা লেখা হয়েছে। মহৎ কবিকৃতির আন্তর্জাতিক ইমেজের তুলনায় এটা খুব সামান্য অর্জন। কিন্তু তার যোগ্য অংশীদারীত্ব সঙ্গতকারণেই বর্তায় কতিপয়ের উপর। ১৫/১৬ বছরের কবিতাঅভিজ্ঞতার আলোয় দাঁড়িয়ে এটুকু বুঝেছি, মেধাসঙ্কট নিয়ে ধান্দাবাজীর রাজনীতি ক'রে ঠুনকো নাম কামানো সম্ভব। হাততালি, নির্বোধ প্রশংসা এমনকি ফুরফুরে বালিকার পাতলা প্রেমও পাওয়া সম্ভব। শুধু কবি হওয়া অসম্ভব। কবিতার মতো এত অনিশ্চিত এত চোরা ঘূর্ণিময় শিল্পের জন্য সধৈর্য জীবনাতিপাত সবার পোষায় না। যিনি পারেন বুঝতে হবে তার মধ্যে শক্তি আছে; শ্রদ্ধেয় কবিত্ব আছে।

আমি মধ্যপন্থী নই। আমার কাছে একটি লেখা হয় কবিতা না হয় পদ্য। এটা করলে ওটা হলে রচনাটি কবিতা হয়ে উঠতে পারতো এরকম মন্তব্যে ইদানিং আমি আস্থাবান নই। পরন্তু 'প্রতিশ্রুতিবান' এই প্রতারক শব্দটির দুষ্ট ভূমিকা বিষয়েও আমি এখন পূর্ণসচেতন। তরুণ কবি কথাটার ঢালাও প্রয়োগ সম্বন্ধেও আমার একই অভিযোগ। দুয়ের কোঠা পেরিয়ে তিরিশে পড়েছে যে যুবক অথবা যার এখন উত্তরতিরিশ পর্যায় চলছে, তিনি হয় কবি না হয় কবি নন।

র‍্যাবো মোটে ৪/৫ বছর কবিতা লিখেছেন। কীট্‌স লিখেছেন ৭ বছর। মহান ক্রিস্টোফার মার্লোর সাহিত্যজীবন ৮ বছরের বেশী নয়। চল্লিশের গোড়ায় বা চল্লিশউত্তীর্ণ বয়সে কবিস্বীকৃতি এক ধরনের ঠাট্টা ছাড়া আর কি।

আমরা নতুন কবিতার দিকে নতুন চিন্তা আর নতুন শব্দপোষাকের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আমাদের এই সমবেত অভিযাত্রা। মাঝে মাঝে প্রাচীন বটের নিচে তেরাস্তার/চৌরাস্তার মোড়ে মিলিত হই আমরা। ---*Miles to go Miles to go before I sleep ……*

....

....

সম্প্রতি একটা চিঠি পাওয়া গেলো। আমার ঠিকানায় যদিও, কিন্তু অনেকেই দেখেছে।

....

....

বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বহুদিন ধরে আপনাকে লিখব লিখব করেও লেখা হয়নি। আমার অবস্থা সংক্ষেপে বলতে গেলে 'চতুর্দিকে ব্যাপ্ত অন্ধকার'। নিজের এবং পরিপার্শ্বের সৃষ্ট নানান ঘটনার চাপে বোবা হয়ে গেছি। আমার স্বপ্নকল্পনাগুলো এক গভীর ষড়যন্ত্রে মিলে পেয়েছে ফ্রাংকেস্টাইনের চেহারা। আমাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ধাবিত। কিন্তু আত্মধ্বংসে মেতে ওঠার সাহস হয়ত নেই, বাস্তবতাও অন্যরকম। ফলে হৃদয়ের কষ্ট পৌঁছেছে শারীরিক পর্যায়ে।

এত সব কথা আপনাকে কেনইবা শোনাচ্ছি ? আপনার সাথে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আমার কখোনোই কথা হয়নি। তবু ঠিক বুঝতে পারছি না এসব কথা আপনাকে বললাম। হয়তো কবিতার কাছে আমাদের চাওয়ার ধরণটি এক রকম।

লেখা চেয়েছিলেন। সংবাদ হল, আমি কিছুই লিখছি না। ঠিক লিখতে পারছি না নয়, লেখার ইচ্ছাটাই যেন ফুরিয়ে গেছে। শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছি মনে হচ্ছে। এজন্য নয় যে আমি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। আশাবাদী ছিলাম। বইটা বের হবার পর সবাই বললো 'ভাল ভাল, প্রতিশ্রুতি রয়েছে' ইত্যাদি। এসব কথা শুনে যথেষ্ট হতাশ হয়েছিলাম। এগুলো যে মুখস্ত কথা এতটুকু বোঝার বুদ্ধি আমার ছিল। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল মৃত সন্তান সৃজনের মত।

কিন্তু এটা নিয়েও আমি ভাবছিনা। আমাকে ছাড়া বাংলা কবিতা সচ্ছন্দেই চলবে। তাছাড়া আপনার কবিতার পাঠক হিসেবেও আমি প্রায় লেখার কাছাকাছি তৃপ্তি অনুভব করি। আমার প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন এবং অর্থবহ একটি জীবন। সমস্ত আনন্দ তারুণ্য আমি খুইয়ে বসেছি। আমাকে আশাব্যাঞ্জক কিছু বলুন। উপদেশ দিন। বিভিন্ন কারণে আমি বেঁচে থাকতে চাই - কবিতা সহ।

সুমন রহমান

....

ঈশান জয়দ্রথ রচিত কাব্যগ্রন্থ *ঝিঁঝিঁট*, নিউম্যান বুকস, ১৯৯৪, গ্রন্থের *শিকড়ের কথা শুনে* কবিতাটি পড়ুন। সম্ভবত ভুলে গেছেন আপনি উক্ত নাম ধারণ করেছিলেন একদা। *সামান্য বাতাসে তারা ঝাঁক বেঁধে বজরার মত ভাসছিল* কারা তারা?

এ প্রসঙ্গে রিফাত চৌধুরীর রচনাটি প্রণিধান যোগ্য। কা.শা

....

রিফাত চৌধুরী

আমার কথারা

কি প্রয়োজন আর লেখার। একটু আধটু যা লিখি সে সব ছাপার প্রয়োজন দেখিনা। অনেকেই তো লিখেছে। আমার বন্ধুও (কাজল শাহনেওয়াজ) তো লেখে। ভালোই কাজ করছে ও। লিখেছিলাম, লিখছিলাম একটা সময়ে। দরকার মনে হয়েছিল, তাই। আর লিখে নাম ডাক করার বাসনা তো কখনই ছিল না। নিজেকে বড় কবি হিসেবে কখনই ভাবি নি। নিজের ওপর আলোকপাত করার প্রয়োজন কখনও বোধ করি নি। এসব সমালোচনা টমালোচনা হওয়া না হওয়ায় আমার আজকাল আর কিছু হয় না। আগেও হতো এমন নয়।

সভা সমিতিতে যাই না বটে, শিল্প সাহিত্যের অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি বিরল। তবু আমি শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছি নাড়ীর টানে। খোঁজখবর রাখি কোথায় কি হচ্ছে। শুধু বাংলাতেই নয়, ভিনপ্রদেশী সাহিত্য সম্পর্কেও।

একটা উদ্দেশ্যহীনতা আজ সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। কবিতা সম্পর্কে, সম্ভবত, এটি সর্বাধিক সত্য। যে কোন চারখানা কবিতার বই হাতে নিলে মার্জিতরুচির পাঠক অন্তত তিনটির ক্ষেত্রে স্বল্পতুষ্ট। শো-কেস-বুক হিসেবে একটি কবিতার বই সংগ্রহের জন্যে তাঁকে অন্তত কয়েক ডজন কবিতার বই পড়ার শ্রম স্বীকার করতে হবে। কবিতার বই তিমি মাছের মতো ক্রমবিলীয়মান।

কবিতা কি, একজন কবি কেন না লিখে পারেন না, দুনিয়ায় এতো কাজ থাকতে তাঁর মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য কবিতার সেবায় নিয়োজিত- এইসব প্রশ্নে কলম ধরেছিলাম আমিও। গভীর কোন কর্তব্য বোধই যে আমার শিকড়ে শিকড়ে কাজ করে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কীর্তি এবং কর্তব্য সম্পর্কে নন্দনতত্ত্বের জাগ্রত প্রহরা আমার চলাপথের দিক নির্দেশ দিয়ে গেছে সর্বক্ষণ।

আশীতে

কবি পত্রিকার প্রায় জন্মলগ্ন থেকে কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এমন একজনের কাছ থেকে মন্তব্য শুনতে আমি মরণপন ভনিতা শুরু করলাম, যাতে এই যুবকের প্রতি করুণা করে হলেও তিনি মুখ খোলেন। দুর্ভাগ্য তিনি এই যুবকের বরফ গলাতে পারলেন না।

কারো মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারবেন না। এখন আমি তাই ওদের সম্পর্কে কিছু বলবো না। জল ঘোলা করে কি লাভ।

বিভিন্ন কবির মুখে শুনেছি আপনাকে নাকি আজকের বহু নামি কবি সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে। আপনি চন্ড অভিমানে তাই বধির হয়ে থাকতে চাইছেন, এতে কি অন্যায়কে মেনে নেওয়া হচ্ছে না। আপনার মতন কবিদের হারিয়ে ফেললে তো বাংলা কবিতার ক্ষতি।

ক্ষতি কি লাভ সেটা আপনারাই বুঝুন।

সঠিক মূল্যায়ন হয় কিনা তাই নিয়ে এই লেখা অথচ আপনি যদি সবকিছু না জানান............

সবকিছু অন্যান্য কবিদের কাছে জানতে পারবেন। আমি তো কবিতা আন্দোলনের কেউ নই। তরুন কবি ছাড়া আর কিই বা আমি। আমার কাছে ঐ সমস্ত কথা জেনে কি লাভ।

আপনার কি মনে হয় না সাহিত্য পত্রিকাগুলো শহর কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। পত্রিকার মূখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে পড়ছে? আমাদের ধারনা পাঠক পাওয়ায় আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন- আপনার অভিমত কি?

আসলে কবিতার পাঠক সংখ্যা নগন্য হওয়ার মূল কারণ সার্বিক অবক্ষয়, যা বাংলাদেশের সামাজিক/রাজনীতিক/ অর্থনৈতিক কারণগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে এটা কিছুটা স্বীকার করি যে, প্রতীক কবিতাগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন ।

অগ্রজ কবিদের সম্পর্কে কিন্তু বহু অভিযোগ আপনারাই শুরু করেছেন ?

দেখুন কোন বুদ্ধিজীবী বা কবি কি ভাবল এনিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই- কার থেকে দূরে রয়েছি বা কে আমার অবদানকে অস্বীকার করলো আজ আর এসব একদম ভাবি না। একই মানুষকে পাঁচরকম পরিস্থিতিতে পাঁচরকম ভাবতে দেখেছি, আগের ধ্যানধারণা, বিশ্বাসকে কনট্রাডিক্ট করতে দেখেছি, সত্যকে এড়িয়ে যেতে দেখেছি; মানুষটা নিজের কাছে ছোট হয়ে গেল, এও দেখলাম। এসব দিয়ে কি হবে বলেন? প্রয়োজনে, স্বার্থে অনেকেই রং পাল্টায়- কিন্তু যেটা সত্য সেটাতো চিরকালই সত্য। ওটাকে ইরেজ করা খুব কষ্ট তার চাইতে মেনে নেওয়া সোজা সহজ এবং মঙ্গলকর। অভিযোগ দিয়ে কি হবে?

আপনি কি নিজেকে একজন সফল কবি বলে দাবি করতে পারেন?

দেখুন কবিতাচর্চ্চা একটা অসীম ব্যাপার। এর ব্যাপকতা ও গভীরতা কল্পনায়ই আনা যায়। পাঁচটি মহাসাগরকে যদি একত্রে ভাবা যায়, তাহলে কবিতাচর্চ্চা তার চেয়েও ব্যাপক। মহাসাগরের কূলে সাঁতার দিয়ে সাগরের রত্নরাজি শুধু মাত্র উন্মাদই করতে পারে করতলগত। তবে এ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে যতটুকু আত্মপ্রত্যয় থাকা দরকার তা আমার আছে এবং অধিকাংশ কবিতা আমার সফল হয়েছে।

সত্যি, কবিতাচর্চ্চা বিরাট এবং দুরূহ বিষয়। এক জীবনে এই কবিতা সম্পূর্ণরূপে জানা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে তার নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, স্পষ্টবাদিতা ও আত্মপ্রত্যয় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অতুলনীয়।

•

আসলে মূল সমস্যাটা কোথায়? মানুষ তার স্বকীয় যোগ্যতা, প্রতিভা ও অধিকার অনুসারে সঠিক পথ ও কর্মকে বেছে নিতে পারছেনা। একটা মোটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায়- শামসুর রাহমান যেমন শহীদ কাদরী হতে পারেন না, আবার আল মাহমুদ যেমন আবদুল মান্নান সৈয়দ হতে পারেন না, তেমনি আবদুল মান্নান সৈয়দও আবিদ আজাদ হতে পারেন না। আর এই যে

কবিতা নির্বাচন ও এগিয়ে যাবার পদ্ধতি- অর্থাৎ কার কোন লাইনে যাওয়া উচিত, কখন কোন কবিতাটি লেখা উচিত, কোন কবিতায় কতটুকু শ্রম দেওয়া উচিত, এ ব্যাপারে একজন বিজ্ঞ কবির সহযোগিতা ও পরামর্শ কবিজীবনকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ভাষা যথেষ্ট জানলেই কি একজন কবি অন্যভাষার কবিকে ভাব ও ভাষাগত কবিচরিত্র যোল আনা বজায় রেখে ত্রুটিহীন ভাবে অনুবাদ করতে সক্ষম হন?

কবিতার অনুবাদ হয় না, কারণ শব্দ তার সকল সফল অনুষঙ্গ নিয়ে আসতে পারে না অন্য ভাষায়। কবিতার অর্থ আরোপিত এবং কার্বন নকল ঝাপসা হয়।

অনুবাদে ক্ষয়ক্ষতি কিছু থাকবেই তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ব্যবধান অনুবাদে থেকেই যায়। কিন্তু তা ক্রমশই বেড়ে যায় যখন মূলের পরিবর্তে, ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

অনুবাদ মানে কখনই অনুলিখন নয়। অনুবাদ মানে পুনর্সৃজন, প্রতিশব্দগুলির মধ্যে ঠিক শব্দটি বেছে নেওয়া, যা অনুবাদের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও মূল অভিজ্ঞতার রূপটি তুলে ধরে।

কারিকুলাম ভিটা

বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী বা ছাড়পত্র ওর ছিলনা। তাই চাকরির বাজারে ওর কোন মূল্য নেই। এছাড়াও চাকরির জন্য উমেদারি করাও ওর পোষাতোনা কারন ডিগ্রী যেমন ছিল না, ঠিক তেমনি কোন লোকের সুপারিশও, কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুলতো ওকে। তবুও যেকোন একটা কাজ ওর দরকার।

অথচ সব কাজেই আন্তরিকতা ছিল, লেখাপড়া ছিল, দেশী বিদেশী সাহিত্যচর্চা আর সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহ ছিল। শিক্ষাগত ছাড়পত্র বা ডিগ্রী অর্থাৎ প্রমান পত্রর মূল্যে যার কোন পরিমাপ করা যায় না।

মানুষেরই জীবনে বিচিত্র কাজ আর চরিত্রের অভিজ্ঞতা জ্ঞানের ব্যাপকতায় প্রসারিত। সমাজ সম্পর্কে ওর চিন্তাধারাও অসীম। তবু কারও কাছে ওর সেই চিন্তাধারা বা জ্ঞানের মূল্য নেই। কারণ ঐ মূল্যের মূল্যায়ন করাতে প্রয়োজনীয় টাকা বা ডিগ্রী বা লোকবল ওর ছিল না। কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একটু ভদ্র কাজ অর্থাৎ কর্ম বিনিয়োগের দ্বারা উপার্জন ওর হয়নি। দেহযন্ত্রে খিদের যন্ত্রনাও অসহ্য আর সেই যন্ত্রনা মকুব করতে খাদ্য নেবার টাকা নেই !

এখনও কবিদের সম্পর্কে সমাজের ভ্রুকুটি - আপনার কি বক্তব্য?

কবি যার নিজস্ব কোন আয় নেই, এই যে সে পয়সার কথা ভাবেনি, আমি দেখেছি সে রাস্তায় বেরলে পকেটে কি পয়সা আছে খোঁজ পড়ত, দেখেন, এই যে লড়াই করার মেজাজটা, এইটাই একটা বিরাট ব্যাপার। একটা সময় গেছে যখন চাকরি করবে বলে ভাবছেন, অথচ করতে পারছেন না; তখন ছেলে নিয়ে পরিবার নিয়ে সে যে যন্ত্রনা ভোগ করেছে সে তো তখন চাইতে পারতো যে অন্য দিকে চলে যেতে রোজগার করতে, সেটা যে হয়নি;এই দেয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি তাঁকে দিয়েছে এই কবিতাটা। তার সামাজিক পরিচয়টা কারই তো অজানা নয়, সেখানে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে কবিতা। এই চেহারা আর কখনও কারুর দেখিনি। ওর মধ্যে একটা খুব ইনটেনসিটি আছে।

কবিদের কাছ থেকে এতটুকু সৎ স্বীকারোক্তি পেতেও আমরা ভুলে গেছি। কবি প্রতি স্তরে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এটা এক অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। সমস্যার সম্মুখীন না হয়ে আত্মবিশ্লেষনে অনীহা ও বাস্তব ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করে কল্পনা-বিলাসের আশ্রয়ে মুখ লুকিয়ে থাকা কবির ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটু কম তিক্ত ধন্যবাদ তাকে জানাচ্ছি এই প্রসঙ্গে তার আর একটি উক্তির জন্যে। তিনি খোলাখুলিই বলেছেন, লেখক তালিকায় যাঁদের নাম আছে তাঁদের লেখা প্রকাশের জন্য সরকারি/বেসরকারি যেসব প্রকাশনা সংস্থা আজ অবধি জন্ম হয়েছে, সে সব সংস্থা কখনই আশানুরূপ সফল হলনা। খাঁটি কথা বলেছেন তিনি।

আদি পাপ কার কতটা সে নিয়ে অনেক আলোচনা আমরাও করেছি। সাঙ্ঘাতিক প্রায়শ্চিত্ত যে বহুকবিকে করতে হবে, এবং দেশের তরুণ কবিকেও যে কবিতায় জ্বালানো আগুনে পুড়তে হবে, সেই কথাও আমরা বার বার বলেছি। সব কটু কথাগুলোই ফলেছে। তার কথা শুনে মনে হয় যে আরও বীভৎস ভাবে ফলতেই থাকবে। এবং তিনি এটাও জানেন যে এমন কবির দল বহুকাল ধরে, রক্তবীজের বংশের মতন গজাতেই থাকবে।

আমাদের বর্তমান সমালোচক, প্রকাশক এমন কি অন্তরঙ্গ কবি মহলের চরিত্র দেখে মনে হয়েছে যে কবিতা সাধনার অন্তঃপুরটাকে যতো ওদের থেকে তফাতে রাখা যায় ততোই সাধনার ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা কমবে।

কবিতার সঙ্গে প্যাশনের/আবেগের কোন সম্পর্ক আছে কি?

যখন আমরা যেটা করি তার মধ্যে মনের আবেগ মেশানো থাকে। অতএব আবেগের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক আছে।

মনের উপর কবিতার প্রভাব কতখানি?

অনেকখানি। কারন মন যা চায় আমরা তার বাইরে যাই না। দেখুন কবিতা ব্যাপারে অন্তত আমি নিজেকে দিয়ে বিচার করে বলতে পারি মনের উপর কবিতার প্রভাব আছে।

আপনি কি একটা নিজস্ব কবিতাকে ধরে রাখতে চান, না আজ এই কবিতা তো কাল ঐ কবিতা এইরকম মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেন?

কবিতা হচ্ছে ঠিক সাগরের ঢেউয়ের মতো। ঢেউ যেমন আসে নতুন কবিতাও তেমন আসে, আবার সেই ঢেউ যখন মিলিয়ে যায় তখন সেই নতুন কবিতাও চলে যায় বা পুরানো হয়ে যায়।

আমার কথা ভাববারও লোক আছে পৃথিবীতে। এই পৃথিবী অনেক অনেক বড়। তাই, এক কথায় আমি তাকে নিয়ে আসতে পারি না আমার ছোট ময়লা মুঠোর মধ্যে। আমার চোখ যতদূর যায়, তার বাইরেও রয়েছে জগৎ। আমার চিন্তার পরিধির বাইরেও রয়েছে অনেক কিছু ভাববার।

এখানেই একবার ছেদ পড়েছিল। কথাগুলো মনে আসতেই তার মনে এলো দৃঢ় সঙ্কল্প। না, দুর্বলতার কাছে সে আর পরাজয় স্বীকার করবে না।

বেশ কিছুদিন সে আরো অন্য ভঙ্গির আঁকা শিখছে। তাছাড়া অভাবের তাড়না আছে। আছে প্রেমে পড়তে চাওয়ার যন্ত্রণাও।

এতদিন শিল্পের পাঠ নিয়েছি। এখন নিচ্ছি শিল্পীর পাঠ। আর্টিস্টকে স্টাডি করছি এখন। মহান শিল্পীদের সম্বন্ধে সে অনেক বই পড়েছে। তাদের আঁকা অনেক চিত্র দেখেছে। দেখে দেখে তার আশ মেটে নি। রসপিপাসার শেষটুকু পর্যন্ত সে উপভোগ করতে চেয়েছে।

সে মনে করল ভ্যান গগের কথা। সে বার বার প্রেমে পড়েছে, বঞ্চিতও হয়েছে এবং সংসার থেকে বিদায় নেবার জন্য সূর্যের দিকে মুখ করে নিজের রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ভিনসেন্ট ভ্যান গগ হল্যান্ডের ছেলে। জন্ম তার এক সামান্য শহরে, কিন্তু প্যারিস ভরে দিয়েছিল তার মনের পেয়ালা। প্রেম আর প্রাণের টানাপোড়েন চলেছিল তার সারা জীবন ধরে। কিন্তু সে জীবনকে যতই ভালোবেসেছিলো, জীবন তাকে ততই ঠেলে সরিয়ে দিত। এমন কি তার চিত্রশিল্পও তাকে বেঁচে থাকার সময়ে সাফল্য দেয়নি। সে ছবিগুলি জলের দরে বেঁচে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু কোন সংঘই তাকে পছন্দ করত না। ভুখা চিত্রকরকে কেনার অছিলায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না কেউ। প্রেম তার বড় প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু কোন ভাল ঘরের প্রেমিকা পর্যন্ত তার জোটেনি। আজ পৃথিবী তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছে। মাথায় তুলে নিয়ে একজন সেরা শিল্পী বলে হৈ চৈ করছে। তার জীবন যন্ত্রণার কাহিনী নিয়ে লেখা উপন্যাস নাকি প্রথম প্রকাশেই ষোলবার ছাপা হয়েছিলো। সৃষ্টির তীব্র আকুলতা তার বেঁচে থাকার সময়ের ব্যর্থতাকে বিরাট ব্যথায় ভরে তুলে ছিলো।

সে সব এখন শুধু অতীতের কাহিনী। সে একবার নিজের দেশের আকাশ লক্ষ্য করে তাকালো। এমন যন্ত্রণা এ দেশেও কত প্রতিভা সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু চিত্রশিল্পী নয় - কবি, সাহিত্যিক, স্থপতি - সবাই। এবং প্রেরণামত, প্রতিভাকে প্রাণের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে তোলার মতো প্রেমের পরশও হয়তো মেলেনা।
সে মনে করল পল গগ্যার কথা। সৃষ্টির বেদনায় সে সমাজ দেশ সব ছেড়ে সাত সমুদ্র পেরিয়ে তাহিতি দ্বীপের আদিবাসিনীদের মধ্যে অপরূপাকে খুঁজেছে।

সে মনে করল তুলু লত্রেকের কথা। উদ্দাম বোহেমিয়ান জীবন নিয়ে ছবি আঁকতে উন্মাদ আশ্রমে তাঁকে ঠাঁই নিতে হল। কিন্তু এঁরা তো সব মহান শিল্পী। শিল্পকর্মে বন্দিত হয়েও জীবন ধর্মে

বঞ্চণাই পেয়েছিলেন। প্রতিভা তাঁদের দিয়েছিল সৃষ্টির যন্ত্রণা। কিন্তু ভদ্র সৌম্য সুস্থ প্রেম পর্যন্ত তাঁদের মনের আগুন জ্বালাতে শান্তি এনে দেয় নি।

এখন রোম্যান্সের যুগ আর নেই কেন? তাঁর এবার দার্শনিক হবার পালা। এখন সে দার্শনিক হতে পারে।

সে বলল সত্যি, জীবন রোম্যান্স নয়। শুধু রোম্যান্টিক আশা করতে পারেন যা আমি এতদিন ধরে করেছিলাম। না হয় রোম্যান্টিক স্মৃতি লালন করতে পারেন যা আমার এখন থেকে করতে হবে। এই পর্যন্ত বলে সে করুণ ভাবে আমার দিকে তাকাল। আমার বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সে শান্ত স্থির ভঙ্গিতে এমনভাবে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন যেন এক অধ্যাপকের সামনে দাঁড়ানো তরুন কোন ছাত্র আমি।

আমাদের সবচেয়ে আগুনভরা আনন্দগুলো আমাদের অনুভবগুলোকে পুড়িয়ে ছাইয়ে পরিণত করে রেখে যায়। আশাগুলি ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আজকের দিনের সাহিত্যে সব চেয়ে বড় যে ঢেউ চলছে তার নাম একজিস্টেনশিয়ালিজম, বেঁচে থাকার তত্ত্ব। তারই নিষ্ঠুর ঠাট্টা ঘটে গেল আমার জীবনে।

নিজেকে কুৎসিত কাক তাড়ুয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আর্তচিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, স্টে উইথ মি বিউটি ফর দ্য ফায়ার ইজ ডাইং, তখন তাঁর কণ্ঠে ব্যাকুলতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আতঙ্কও মিলেমিশে যায় নি, তাই বা বুঝি কেমন করে? তাছাড়া ওর নিজের মনও খুব সংবেদনশীল। এতটুকু ছোঁয়া লাগলেই সে রূপে রসে ফাল্গুনী রচনা করে নিতে চায়।

মানুষের মন, আমাদের চারপাশ, দেশ কালের সমস্যা কোনটাই ওর কবিতায় বাদ যায় না। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমাজবোধের বীজ ছড়িয়ে দিতে চায়। সময়টাকে মরা মানুষের মতো কেটে ছিঁড়ে ময়না তদন্ত করে দেখাতে চায় সে। একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে সে যোগ করলো, খুব ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে অন্তত আই অ্যাম ফিলিং অ্যাট দ্য টপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড। সে এদিন সারাক্ষণ তার শিশুপুত্র মৌলিককে কোলে করে ছিলো, কোল থেকে নামলেই সে ধরে ফেলছিলো মৌলিককে।এই লেখা লিখতে বসে এই মুহূর্তে আমার স্মৃতি অসংখ্য জোনাকি হয়ে বার বার জ্বলছে আর নিভছে, ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার কানে বাজছে, আর পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কবিতার কর্মী হয়ে জীবনের অনেকটা পথ একলা চলে এসেছি। কবিতার ছন্দ ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে আমার কবি জীবন। কিন্তু এই লেখা লিখতে বসে আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি কি একটাও কবিতা সঠিক ভাবে রচনা করেছি ?

আহমদ মুজিব

প্রেমের কবিতা

লোডসেডিঙের ভিতর ফুটে উঠছে আমার ব্যক্তিগত বিদ্যুতের প্রেমমুখ।
বহুদিন লক্ষ্য করেছি, গোপন চাপ ও তাপে
আলোহীন আমার বুকে একটুকরা কয়লা শুধু হীরা হ'তে চলেছে।

কালো একজোড়া জুতার কালিকে পেয়েছিলাম সেদিন।

পেয়েছিলাম আমার নি:সঙ্গ পকেটে থাকা ঠিকানাময় কাগজগুলোর নিচে ঐসব অন্ধকার মুহূর্ত।
আর সড়কে কালো মাটির স্তুপকে ঘুমন্ত ঝোপ ভেবে
পেয়েছিলাম সারারাত বণ্য ফুল ফোটার সুতীব্র ভাবনা।

কিন্তু জানা, কোনদিন, সামান্যভাবে, তোমাকে পাবো না আমি
গাছের মন থেকে, ধীরে ধীরে, তোমাকে লক্ষ্য করে পেয়ারাফুল ঝরে।

ছানি কাটার পর

আবার সে খবরের কাগজ পড়ছে মনোযোগে, অনেকক্ষণ ধ'রে
কিংবা ছোটখাটো হরফে লিখছে সবুজ গ্রামের উদ্দেশ্যে সবিশেষ চিঠি।
তাঁর চোখে শ্রাবণের ক্ষুদে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি এড়িয়ে যায়নি -
আন্তরিকভাবে টাউনহল বাজারে গেলে সে দেখেছে বেগুনের ভিতর কীটের যে কালো গহ্বর তা-ও।

এমন পিতার পুরোনো বুকে মাত্র একবার আমি সামান্য কান পাতি :
তাঁর দুচোখের গভীরে আরো দুটি চোখের কথা দ্রুত শোনা যায়, হয়তো।

প্রিয় আমার

প্রিয় আমার কালো আঙ্গুরের নিস্তব্ধ থোকা,
প্রিয় আমার কালো সুতায় বোতামকে বাঁধতে চাওয়া।
রক্তাক্ত, প্রিয় আমার কালো গোলাপ ফুটন্ত উদ্ভিদে
একই বাগানে অবিশ্বাস একই বিচ্ছেদে।

পীচঢালা লম্বা ক্ষেতেক্ষেতে যেতে যদি হারাই অস্তিত্ব
এক নীরব পাথর ও পীচধ্বনির রিক্ততার কথা মনে পড়ে আমার।
এই শহর রক্তাক্ত কাঠকয়লার মুখ দেখে না।
শুধু দেখি, গাড়ি কিংবা কারখানার চিমনি ছুঁয়ে
এক পরিত্যাক্ত পাখির ঝাঁক অন্তহীন নীলে।

প্রিয় আমার বলো নিজেকে সান্তনা দিই:
না শাদা তারা, শুধু তোমাদের প্রতি নয় এই দৃষ্টি নিযুক্ত
সারারাত জ্বলজ্বল করে, আমার বিরাট কালো তারা সে।
আর উঁচু কবিতার খাতার সামনে নত আমি -
আমি বহমান পাহাড়ি বলপেনের নষ্ট ঝর্ণাধারাই।

প্রিয় আমার, আজ ঐ কালো তারার শ্বাসপ্রশ্বাসের বহু নিচে
তবে সপ্রাণ ছোটাছুটি করি
পাথর সরাই, কাদাকে ঠেলি ঈষৎ।
তবে আমি নুড়িকে মাড়িয়ে যাই
লোকালয়ে ঢুকি এবং উপড়াই লতাগুল্মবৃক্ষ।
প্রতিদিন একটি কবিতার জন্য
প্রিয় আমার একটি নতুন স্বরের জন্য প্রতিদিন
লেখার টেবিলে!

মাহবুব কবির

হত্যামুখরিত দিন

আজ ঈদ। আজ ছুরি দিবস।

উল্লাসে ফেটে পড়া ছোট ছোট ছুরি
আর চাকুদের পিতা রক্তাপ্লুত নেশায়
চুর হয়ে ঝিম মেরে
বসে আছে কাছেই
তার চোখ হিলহিলে তৃপ্তিতে ঢুলু ঢুলু আঁকাবাঁকা।

এদিকে ছুরিদা ও চাকুদা
কী দ্রুত ছড়িয়ে দিচ্ছে
ফর্ ফর্ ধ্বনি
এইভাবে দিকে দিকে ছুরি আর চাকুদের
উৎসব আজ। আজ ঈদ।
হত্যামুখরিত দিন।
আহা,
নতুন পোশাকে আনন্দে মেতেছে শিশুরা।

অশুভলিপি

ঘুম ভাঙালো কচ্ছপের ভেঁপু চিৎকার।
ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর সৌরটিকা
ভোরের হাওয়ায় নেচে উঠে দেখি
গাছে গাছে ঝোলে মরুভূমি,
খুশিতে দুমুখো হয়ে শামুক ও মৎস্যের
মিছিল গুনি,
ধোঁয়াশার দানা নিয়ে চোখের পুতলিতে
কুয়াশার লেজ ধরে নাচি
'আহা ডেটল জীবন
উহু ডেটল জীবন!'



শশী হক

নিয়তি অধ্যায়ের কাছে দাঁড়িয়ে

নেই জনতার সেই আশ্বাস আর নেই। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে নিভে আছে এখন
অশ্রী যত কাঁচের কথা অর্থাৎ ব্যর্থতা। প্রশ্নহীন গ্রামজ অক্ষমতাগুলি
আকাশডোবা বিশাল নির্জনতার কাঠামোতে রক্ত রৌদ্র স্বপ্নের স্যাঁতস্যাঁতে সঙ্গমে
আলিঙ্গন ঢুকে আছে। সাথে মোমের মত ঘর এবং ঘরাবলী, গাঁথা
ধূর্ত ছায়াদের রহস্য আর প্রেম, ঈর্ষা আর অরব মর্ষতা। ঢুকে আছে
হু-হু বাতাসের বাহু, শৈশব শ্বাস, অন্ধকারের নিভৃত নদী
আর ঘড়ির মত বৈঠাটির সেই দুঃস্বর আওয়াজ যা প্রতিবার প্রতিদিন প্রতিরাত
ইচ্ছে থেকে ছিঁড়ে দেয়া আশা
ভুল থেকে প্রিয় ভুল ,বধির স্রোত থেকে শব্দের হাওয়া
হাওয়া থেকে ঘুম ঘুম থেকে রাত রাত থেকে দিন এবং দিন থেকে দিনের অবশেষ
ছাই এবং ছায়া।

নেই এখন আর আরাধ্য কিছুই নেই। ধূসর গ্রহ জোনাকি আর উঁইয়ের জটিল
আকাঙ্খা ছাড়া মগজের কোষে অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। কাঁচা অন্ধকার আধার
নেই। নিদ্রা শেষে বাসনার অস্পষ্ট পাতায় অর্থহীন প্রভাত সঙ্গীতটির সাথে শুধু
সুর মেলানো ছাড়া কিছুই নেই আর সামনে দাড়িয়ে থাকা দক্ষতাকে দেবার
কাউকে কোনকিছু শুধাবার।



অমিতাভ পাল

প্রসাধন

সূর্য ডুবে গেল বাড়িদের ব্লাউজের আড়ালে
অন্তর্বাসের হুকের মতো
এখন প্রয়োজনীয় আলো স্তনের মতো
লুকিয়ে পড়বে রাতের ভিতরে
জ্বলে উঠবে বিভিন্ন প্রকার বাল্ব
অজস্র আভার মতো মাঝে মাঝে তারা ঝিকিয়ে উঠবে
অন্ধকারের সুচিক্কন গালে

ব্লুফিল্ম

শুরু হলো একটি শুষ্ক ঝকঝকে বাথরুম দিয়ে
তার অপেক্ষারত বেসিন খুলে
বেরিয়ে এলো কামোত্তেজনার প্রথম জল

তারপর কমোডের উত্তাপ
যেন একটি আশ্চর্য যোনীর জন্ম হলো তার তীরভূমি ছাপিয়ে
প্রবাহিত হলো অজস্র আকাঙ্খার শব্দ

সবশেষে শাওয়ারের বিক্ষোভ
একটি চমৎকার সংগমের ধারাবাহিক ইতিহাসের শেষ স্তরের মতো

যেন কুমারীত্ব হারালো একটি নতুন বাথরুম

পারিবারিক মুরগীদের খামার

পেয়ারা খাবার সময় আমার মুখভঙ্গি শিম্পাঞ্জির মতো লাগে
মাংস খাবার সময় সচরাচর বাঘ
আর মহিলাদের সময় উত্তেজিত অযথা প্রেমিক

এই সব বৈশিষ্ট আমার
একটি পারিবারিক খামারের গৃহপালিত
মুরগীদের মতো এরা থাকে

স্ত্রী

প্রতিদিন রক্ষিত জিনিসপত্রের উপর
পতিত মলিন ধূলা বারবার
পরিষ্কৃত হয় এবং
চকচকে থাকে একটি উজ্জ্বল
সুবেশী দোকান

একটি দোকান আমার স্ত্রী

ড্রয়িংরুম

অতিথিবিহীন একটি ড্রয়িংরুমের মতো নিরব গভীর বন
বনে অনুষ্ঠানহীন একটি টেলিভিশনের মতো একটি নিশ্চল ঝোপ
ঝোপের পাশে প্যাসেজের মতো শব্দহীন ক্ষিপ্র রাস্তা
রাস্তায় কার্পেটের মতো ঘাস
ঘাসে ইতস্তত স্যাণ্ডেলের মতো পরিত্যাক্ত পাতা

বনের দেয়ালে একটি প্রস্তুত বাঘের ছবি
আর একটি নিহত হরিনের চামড়া



সরকার মাসুদ

ডাকবাক্সের কবিতা

ভাগ্যিস সেই সন্ধ্যা এসেছিল মফস্বলী সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে।
একদিন জামার পকেটে জরুরী একটা চিঠি
মামুলি মনে হয়। আর হঠাৎ কী মনে
হ'য়েছিল - এই জীবন - অট্টহাসি,
রেস্তোরাঁর কোনায় চুপচাপ লোকটির
মর্মান্তিক ব'সে থাকা ! বাইরে সর্বগ্রাসী
হারিকেন-সভ্যতার শিখাটি লম্বা হ'য়ে
ক্রমশ রাজহাঁসের টানটান গলা হ'য়ে
আমার উৎকণ্ঠা ছুঁয়েছে তখন!
আমার উৎসব-বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হ'তে হ'তে ডাকবাক্সের কথা
মনে পড়ে। চিঠিতে কি বিধুর অন্যমনস্কতা
ছিল সেটা বড় কথা নয়
ভাগ্যিস সেই সন্ধ্যা দমকা ঢেউ তুলেছিল
কণাসুখের মুহূর্তে,...জানো না তো,
হালকা অন্ধকার আলোকলতার মতো অবিশ্বাসে
জড়িয়ে ছিল ব'লে; ডাকবাক্সটি ঝড়ের মধ্যে
দাঁড়িয়ে আছে ব'লে আজও আমার কাব্যে
পূর্ণিমার ভাঙ্গা সাঁকো ফিরে ফিরে আসে।

মহারাণী

মনে নেই বড় বান ডেকেছিল কংক্রিটের শাপলায়
মহারাণীর গোলাপী মুখ কেন মাঝে মাঝে কালো
কলাগাছের আড়াল থেকে মুগ্ধ গঙ্গামবধূরা তাকালো
ভাটিবয়সেও মহারাণী আমাদের লাবণ্যময়ী
বন্যা গেছে, বৃষ্টি নেই, অকালবোশেখী উপড়েছে শুভবোধ
কিন্তু কেউই বোঝেনা দাবাখেলা কে-যে হবে জয়ী
এদেশের প্রজারা এতই অবোধ ! রাজার মৃত্যুর পর
মহারাণীর চেহারা খুলতে লাগলো আশ্চর্য !
সিংহাসনে বসার পর
মহারাণীর মনে ভ্রমর উড়ছে গোল হয়ে গন্ধরাজের চারদিকে
রাজার মৃত্যুর পর একবছর পেরোয়নি আশ্চর্য!
কলেজ পড়ুয়া প্রেমিকার মতো লাগছে রাণীকে
তার গোল সূর্যচশমার ভিতর স্পষ্ট
অরণ্যের বাড়িঘর, ঐদিকে ফাটা জমি, ফিকে
নীল শাড়ী আর বাঘের চোখের মতো
জ্বলজ্বলে শাল চড়িয়ে বেরোয়নি মহারাণী
এখন মনখারাপ জনতাসংঘের চোরা ঘাপলায়
উড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু বৈদেশিক বাগানে, সভায়।

খায়রুল হাবিব

উল্লাস পীরের মজমা

ইট সুরকির পরিত্যক্ত স্তরের পাশে
কবিতার ভেন্ডার খায়রুলের ঘাড়ের ওপর
হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গৌতম মেকানিকের মোটর সারাই'র গ্যারেজ
চিহ্ন চিনে চিনে আমরা কয়েকজন জড়ো হয়েছি
গ্যারেজের পিছনে বিশাল শুড়িনীর ঘরে
কিছুক্ষণ আগেও আমরা শহরের বিভিন্ন আড্ডায়
গোদারের চলচিত্র ব্রেখটের নাটক মার্কসীয় অর্থনীতি নিয়ে
মূলত চাঁদার বাটোয়ারা আর জমিজমার বিবাদ সংক্রান্ত
মৌলবী আর অধ্যাপকদের
গাজানো বিতর্কের সখাসখি খেলা খেলছিলাম

এখন পোষাকি বাকল খুলে
মিউনিসিপ্যাল ট্রাকের ওপরতলো জঞ্জালে
পুঁজভরা ব্রণের আদলে আপেল কমলা আঙুরের পসরায়
ফিকেল মলিন ময়লা নখের ডগুলিতে
খইনিখোর দাঁতের ঝিকুনিতে
পেকে ওঠে হরতন ইস্কাপন রুইতন
দরজায় দাঁড়ায় যাকে শুনতে পাচ্ছ যে গানটা
বাজারে ওটা হটকেক একেবারে আনকোরা
পাথরে পাথর কালো ঝকমকি কালো হীরা
মাজনীল কালো দাড়ি তার টিয়াকাটুর কালোয়াতি টক
জয় গুরু জয় তৃষ্ণার বায়বীয় ভাস্কর্য
মহাশূন্যে মাচা বেঁধে
আশ্চর্য এক আনবিক ধড়িবাজ খেলছে পেশেন্স

কথা কইলে ফাইন
এখন পাগল নাচ

বালতিভর্তি রজনীগন্ধার পাশে
ট্যারাচোখা পকেটমার শিল্পী
চোদ্দ কালারে ছাপা
ভাষা আন্দোলন পিনিক পিনিক
কলকি আকড়ে ধরা
দশ আঙ্গুলে শিল্পের দিকে
চোখগুলো সেটে থাকে
প্যাচপ্যাচে সাপের বাচ্চার মতো
ঘুলঘুলি চুয়ে ঢোকা
আধিয়ারী আলোর রেখায়
শিকারী যে সেইত আজ
সবচেয়ে সম্পন্ন শিকার

ভরপুর চোলাই খাবার পর
রাতদুপুরে খায়রুলের সিষ্টেম
সিষ্টেম চিৎকার

মিলগিয়া সিষ্টেম
অসংলগ্ন কবিতার
শুরু হোক শুরু হোল
কোলন কোলন কিম্বা লালন লালন
ন্যালাখ্যালা সংসার
তারপর হঠাৎ উধাও
ফিরে আসলে দেখা যাবে
প্যান্টের চেন খোলা
ঘুরে এসেছে পাহাড়ে

আত্মভোলা নাট রেঞ্চ

তেলচিটচিটে
ঝাপটাবাজ রাত্রির কণ্ঠায়
আসলি স্বর্ণের চেন

কোন দেহাতী মৃগয়ার নিগড়ে

হাতে পূর্নিমার হারিকেন
নক্ষিছাড়া নাইটপোষ্ট গুলো
ওজনহীন বক্তৃতার মাউথপিস

জাতীয় সঙ্গীতের
সংঘর্ষ বিরোধী সীমান্তে

রবীন্দ্রনাথের দাড়ি নজরুলের বাবরি
পুলিশের বুট পালিশের ব্রাশ
এন জি ওর কচুরিপানা উচ্ছেদ অভিযান

নিরবলম্ব নীল জিনস
পিঠে বাধা ফেনসিডিল
সিলিন্ডার
শূন্যচারী ভুরভুরী
ডিগবাজী খেতে খেতে
বাংলাদেশ কেমন আছো
ভালো
যেহেতু মাথার ভিতর
চাঁদের ব্রজ বাসী বাড়ী
আর সাগরইতো
তিমিনীর শাড়ী
শাড়ীগুলো
জালের ঘুর্নিতে জড়ায়
দাগফুটকি লেজের চরকায়
ময়ুরীরা
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে
পুদিনা পাতার ভর্তা মাখা
নরম বৈঠা ভাতির গ্রাস
আমরা জেরবার অর্থাৎ
চাকা বন্ধ কারখানার

ঝাক ঝাক হোন্ডারোহি ডুবুরীর
লাউয়ের গাঙ্গেয় খোলে
খায়রুল কবি প্রশ্ন করেছিল

তা চলে যাচ্ছে মোটামোটি

বাড়ীঘর গুলো সাগরের তিমি

বন্যা দুর্ভিক্ষ মারীর খবর ছাপানো
সাতরঙ্গিন মাকড়শার জাল
গার্মেন্টসের ঝাঁক ঝাঁক বাঙ্গালি ময়ুরী
গরম গোলাপি বণ্য মাকড়শার রুপালি লালায়
বুনে তোলে জীবনের বিগ্রহের জীবন্ত পোষাক
শার্টের প্যান্টের পকেটে পকেটে পুরে দেয়

অথচ তোমরা কিন্তু কখনো বলো নাই

গুড বাই বাবা কন্ডম পিরের মাজার

অবশ্য কেইবা ধার ধারে
আলতু ফালতু অনুমোদনের
উথ্যানের চুড়ান্তে যখন সত্যিকার ছন্দপতন হবে
দুনিয়াজুড়ে পেন্টাগন সংলগ্নতার

বিয়ারের ক্যান গুলো বর্ষার উপচানো ফ্যানা
ঘ্যাংগর ঘ্যাং লাফ দেবে মহাদেশ থেকে মহাদেশ
লাফ দিয়ে জায়গা বদল করবে কেতুর ওঠা টেম্পো কোষ্টারের
ধোঁয়ায় ধোয়াক্কার ঢাকা শহরের শব্দভর্তি কাঁচের বয়ম

কাচের বয়মভর্তি শব্দের দোকানঘর হুড়মুড়িয়ে
হোটেল রেস্তোরাঁসহ আছড়ে পড়বে
আমস্টার্ডাম নিউইয়র্ক প্যারি লন্ডন টোকিওর
খোলা ফুটপাতে প্রীতিলতা সিরাজ শিকদার
রাস্তাঘাটের শিরায় শিরায় ইন্জেক্ট করবে
জ্যোৎস্নামাখা খেজুরের রস
রসভর্তি কলস গলায় দড়িবেঁধে ঝুলে পড়বো
সত্যবদ্ধ বেদনার সবুজ ইলেকট্রিক পোলে

আমরাতো এও শুনেছিলাম
পাহাড় ও পাহাড়
ট্যাঙ্ক বাহিনীর তাম্বু
মোড়ে মোড়ে
মিছিল থেকে ধরে ধরে
খোলা কোমরে
কান্ধে মেশিনগান
পাহাড়ের দিকে
বেতাল পঞ্চবিংশতী
মাথায় ঠেকায় শোনাবে
সংসার হলো ছারখার
গুনফল শূণ্যের মাঝার
সন্ত্রাসের জটাধারী

টাকার নৌকা নাকি পাহাড়ে চলে
ঢাকার সমস্ত বটগাছ উপড়ায়া
ছেলেদের লম্বা চুল ছাটার জন্য
মিলিটারী নাপিতের ঝুপড়ি
শাড়ীপরা মেয়েদের
আর্মিরা মেখে দিল আলকাতরার পোচ
হাতে মাছধরার কোচ
হাটা ধরলো ঘাস বিচালি জেনারেল
যাকে পাবে পথে বন্দুকের নল
পিতার ভিমরতীর দোষে কেমনে
শূন্যরে যত দিয়া গুন করো
তারপরও কবিতার সোনামুখি সুঁই

কালো কালো উই
কালো কালো কালাসনিকফ
কালিমাতা কাত্যায়নীর
আলটপকা গ্রেনেড ছোঁড়াছোঁড়ি
বাংলা থেকে বসনিয়া
দেহবিচ্ছিন্ন কানকো দাড়া লেজের চচ্চড়ি
তোমরা এরকমটাই চাও

ভেবেছিলাম
গরু রচনায়
সহজ সাবলিলতার পক্ষে
খ দল
বোরখায় কাপড়ে বানানো
সখিনার যোনিগর্তে
চেরাগের ভিতর
অভিজ্ঞতা আমার শিক্ষক
জারিসারি মুর্শিদী
ছোট শরীক
দিনের বেলা

ননস্টপ রেলগাড়ী
ক দল
স্লোগানের সোরগোল
প্যান্টি ব্রা খুলে
আরব্য রজনীর চেরাগ
নির্দলীয় আলাউদ্দিনের হুঙ্কার
সার্টিফিকেট চুদি না
তিন শরীকে জমি ভাগ
কম্যুনিষ্ট ট্রাষ্টির সেরেস্তা আপনার রাইতে
নেতার বৌয়ের শয্যায় উপস্বামী টিকটিকিরে

টিকটিকি তুমি পোকা খাও
তোমার বিষ্ঠিতে একশিরা
সাহায্য সংস্থার ভাড়াইটা
নুনুগুলারে
কাইটাকুইটা ড্রামে ভইরা
নিদারাবাদের গাঙ্গে
বাঁশের সাঁকোর উপর
দুলে দুলে সি এন এন এ কয়
পানির অন্তরে দ্যাখেন
সক্কাল গতকাইল না আগামি
চামড়া ছিলা কাচিকাটা
জমি মাপার আমিনে চিল্লায়
দিলাম কবরস্থানের সামনে
যানা যা কইরা খা চিল্লাস কা
শরমে কয় না
বুক চাপড়ায়
পক্যাৎ পক্যাৎপ
বুগি বুগি ফ্লাইট প্ল্যাস
রোহিঙ্গা চাকমা মারমা খুন
পাখিমারা চিসু চিসু
নিশ্বাসে বিশ্বাসে কোকাকোলা
মাধুরী দীক্ষিতের
মাসিকের তুলা হয়ে
আছাড় খেয়ে মর
মরার আগে জোরসে বলো
জেল
মরার আগে জোরসে বলো
মরার আগে জোরসে বলো

তুমি রূপান্তরবাদীরে
তুমি সৃজনশীলরে
আবৃত্তি কর্মি নাট্যকর্মিগুলার টিপাচিপা মাই

লবন মাথায় পুইতা ফালাও
নাইলে যে কষ্টের কাইতনে ঝুলে পিতলের ঘুনসি
ন্যাংটা বাচ্চাটা দুলে
মায়ে গেসে গার্মেন্সে বাপে চালায় রিক্সা
হেই কোন আবিয়াইত্যা সকালের ফোস্কা
কাইল পোড়া টেরাকোটা নাভিমূল
দলিল দস্তাবেজ সহ
এই যে তোর ভিক্ষার সানকি আর পার্মানেন্ট জমি

দারগা সাব অয় না প্রেমে পড়সে
তয় হাত মুঠ কইরা মিছিলে
অরে অরে অ শহিদ মিনারের অ
পতে পাইপয়সা অতে অভিমান
বুগি বুগি আকামা
রেঙ্গুন থেকে মোগাদিশু
জংলা কেমোফ্লাজে সস্তার কালামানিক চুদুম চুদুম
লটারীর ধুম ধুম ধর ধর

একুশ তলা থেকে পাতালের সংলাপে

আত্মভেংচি দাতে ঘসো সবুজ কিম্বা লাল পেপস

হেগেল হেগেল
এ আনন্দ এ পাগলামী তারিখ বিহীন।

কাজল শাহনেওয়াজ

চন্দ্রবিন্দু ও শ এর কবিতা

পটিয়া বাজারে সারি সারি পাঁঠা বাঁধা, আজ পাঁঠা বাজার, শুক্রবার, ২১ শে শ্রাবণ, ১৪০১ শাল, মহাশড়কের দুপাশে দলে দলে হো চি মিনের শ্মশ্রুমন্ডিত চিবুক, টান টান শিরদাঁড়া, গর্বে খানিক পরপর কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে কচি পাঁঠাগুলি

স্বতঃস্ফূর্ত পাঁঠা গন্ধ মসৃন বিচিগুলি ঢেকে রেখেছে হালকাভাবে তবুও চোখ চলে যায় বারবার।
পাঁঠার তো ওটাই গর্ব।
নিম পুরুষের হাত বারবার পকেটে যাচ্ছে আর ঈর্ষায় পতপত করছে ওদের পতাকা।

বান্দরবানের আনাচে কানাচে ঘুরে বেরাবার সময় পাঁঠার তাকদ চাই
যেন পাহাড়ে চড়তে পারি, নামতে পারি পাহাড় থেকে।

মানস বাস্তবতা

ভেলকি বাস্তবতা থেকে এলাম, বুক জুড়ে থকথক করছে অপারগতার চাপ
আজ চাই পাতায় পাতায় সত্যিকারের সবুজ হিউ, মিহিন গ্রেণের বৃষ্টিকণা, চড়াই উৎরাই ভরা চূড়ান্ত মেঘ
যেতে চাই মানস বাস্তবতায়
যেন কোন পাহাড় জ্বলতে দেখলে বলতে পারি ঃ
ওগো পাহাড়, জুম্মদের হাতে পুড়তে তোমার কি ভাল লাগে ?
আর যেন শে বলে ঃ ওরা ভালবেসে পোড়ায়, ওদের আগুনে কোন হাড় নেই

আমার বুকে খুশীতে চড়ছে ভেড়া, ওদের পড়নে কার্পাশের ভালোবাসা,
আমার ভাজে ভাজে শ্রাবণের কচি ঘাস

গৃহযুদ্ধের দিনগুলি

দিনের পর দিন আমরা অভ্যাস করেছিলাম সুঁইগুলি ফুটিয়ে দিতে পারি কিনা নখে আর ঠিক মরিচ ভেঙে উদ্ধত চোখে ঝাল মাখানোর পুলিশীধরন বালিমোজায় পিটিয়ে অস্থিচূর্ণ করা কতটুকু পারি

মুআনো ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠে গিয়ে ওঁর রক্তপিপাসু এনটি কাটারের পোচে খায়হার পিঠ ৪ ইঞ্চি ফাঁক করতে করতে একদিন চেঁচিয়ে বলেছিলো : মৌলবাদীদের হাতে ধরা খেয়ে কী হতে যাচ্ছে, এইবার বোঝো বাপ, ফাঁড়া সামলাও ....

খুব খাড়াইয়া ফুটানি মারো, চুপ কর শয়তান কাহিকা, বলে আমি বাতাস ভর্তা করতি করতি নানচাকুর বাহাদুরি করি শালার ভোতাচোপা ফাটাতে ফাটাতে

ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে মুআনো কাঁদে ... চুরাশীতে ড্রেন থেইকা তোলার এই পুরষ্কার... হায় রে বালতি কই, বালির!

তারার মিছিলে শামিল হবোনা বলে লাইন ভেঙে বেরিয়ে যাই তখন চৌদ্দটুলীর আকাশ কিছুটা মেঘলা। আমাদের চেটেপুটে খেলো অনেক দিন পরে থাকা শুয়োরের হাড়গুলি, তখন হা হা করতে করতে আবিআ এল.জি. দেখিয়ে শাসিয়েছিলো : মাস্তানি থামাও এবার... মোজা পড়ো সবুট গাছেরা ....

একটা বেড়ার ঘরে আমাকে একা পেয়ে রিচৌ বাবুপুরার খুচরা মাস্তান নিয়ে পায়ের রগ কেটে দিয়েছিলো, যাতে কবিতাশূন্য চুপচাপ হয়ে পড়ি, মুক ও বধির স্কুলে যাই। তীব্র অভিমানে আমি কিছুই করিনি যাতে রক্তস্রোত বন্ধ হয়, চেয়েছিলাম এইভাবে পড়ে থাকি, টিকে গিয়ে কী হবে? কার দিকে তাকিয়ে থাকবো?

এমনকি সায়ানাইড সাথে রাখলে মানুষ কি হাসবেও না?

কেন যে খায়হা যখোন রিচৌকে পেটাচ্ছিল আমি কট লাগা জন্তু দুজনকে ছাড়াতে ক্র্যাকার ফুটিয়েছিলাম জান বাজী রেখে

টানপোড়েনের দিনগুলোতে সবাই আস্তে আস্তে নিজেকে ভুলে যাচ্ছে
আমরা বুঝতে পারছি একটু একটু করে - বিশেষ জাতের সেই পাহাড়ী ছাগলেরা কেন দলবেঁধে আত্মাহুতি দেয়

আমরা বুঝেছিলাম মেরে ফেলা খুবই সহজ, কিন্তু তাতে কবিতা তো একটা পাই পয়সাও ফেরৎ পাবেনা! হারিয়ে যেতে থাকলে আমি ভীষণ অবাক হয়ে আজো একটা জাল হাতে তোমাদের বহির্গমনের পথে দাঁড়িয়ে থাকবো...যাতে অভিমানে পালিয়ে যেতে না পারো?

হারিয়ে যাওয়া যে সহজ!

কেন যে আমার জন্ম হলো চুপসে যাওয়া এই ছোটগ্রহে

কেন যে আমার জন্ম হলো চুপসে যাওয়া এই ছোটগ্রহে

কেন যে দেখতে হয়
মানুষের চোয়ালে রূপার লাগাম তাতে অফুরন্ত হাসি হাসি ভাব, বাকপটুতার অনাবিল যত্ন সাজ

কেন যে
আজ সংখ্যালঘুরাই আন্তর্জাতিক !

পাহাড়ের

পাহাড়ের খাঁজে আষাঢ়ের ঝোপঝাড়
গাছের আড়ালে টংঘরগুলি ছোট
ম্রো বুড়ি হাটে অন্যমনস্ক
পাহাড়ী আনাজে কিছুটা ভাগ পেয়ে

কলাপাতা কাঁপে ঝর্ণার প্রস্তাবে
পাহাড়ের গান গাছেরা ভীষণ বোঝে

একজোড়া গাভী

আমার একজোড়া গাভী। একটা কাঠ, একটা মাটি।
কাঠের গাভী চড়াতে গিয়ে বন চষে ফেলি
মাটির গাভী চড়াতে গিয়ে প্রান্তরে যাই

সব মাঠ এসে সব ভীড় করে
উড়ে চলা চিল, চড়ুই বা অন্যদের গৃহপালিত পশু সমেত
গা ঘেঁষে দাঁড়ায় নদী, বাঁকে বাঁকে হতাশা

এখনো যে পিছুটান। সব কাজের মধ্যে কৃষিতেই আনন্দ।

কোয়াইচিং

পাহাড়ী দেশে যেকোন পাখিকে বলে হ্রা
কোয়াইচিং কোন বেদনা মানে টানে না

অনেকগুলি ঘোনা কাটিয়ে, জনপথ ছেড়ে, গভীর একাকী ছরার ওপাড়ে
একটা উঁচু পাহাড়ের কোলে ও থাকে

এখানে তো বেশ চেয়ার পেতেছে কোয়াইচিং
সযত্নে কি ঢালো তুমি, বাড়ীতে বানানো মধুর প্রাইং?

তুমি কি পড়েছিলে তারাদের ক্লাশে
খড়ের ঘরে আজ নেমে এলে গ্লাসে গ্লাসে
ওগো দীর্ঘকেশী ছাইংবাং হে, কথা বলো তুমি এলোকেশে

এইতো ওখানে একটা হ্রা বসে রোজ বিকালে
আমি এক সময় খুব ঘুরতাম পাহাড়ে পাহাড়ে
সেগুনের পাতা গাল ছুঁয়ে গেলে কখনো
লজ্জায় হেসে ফেলতাম ঠিক তখনি তখনি

খিবো হরিণ কিভাবে খিমা হরিণীকে চেয়েছিলে
শিকারীর চোখে মনে পড়ে কোনদিন?
মজং হিংরেখেঃ ওয়ে - কেমন আছো তুমি কোয়াইচিং?

পাহাড়ের অভিমানে, কালো রাত্রির কপালে যেখানে স্পর্শ করেনি শাদা চাঁদ
নংখ্যাং পিয়াওলা লিফো - একাই হারিয়ে যাবে কি কখনো ঠিক সেইখানে
আমাদের ফাঁকা করে?

ফ্রি স্ট্রীট স্কুল একটি বিজ্ঞাপন বিরোধী পত্রিকা



.....আমি চাই একটা ছোট্ট - কিন্তু তীব্র জীবন ....

মদিগ্লিয়ানি (১৮৮৫-১৯২০)র নগ্নিকা অবলম্বনে কাজল শাহনেওয়াজের কম্প্যুটার ড্রয়িং

Free Street School, A Literary Journal, First Issue, September, 1995, Edited By Kazal Shaahnewaz, From 9 Free School Street (3rd Fl.), Kathal Bagan, Dhaka, Bangladesh.